খবর ৩৬৫ দিনের সঙ্গে বিনামূল্যে

৭ জুলাই ২০২৩

রূপান্তর

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

MAT-X

Condition Apply*

10500/-

6500/-

Delta

Auto Clean Chimney
Suction Power 900 M³/hr

LCD

Just Call Free Home Demo All Bengal

Mob. : 9051681167 / 9007595617 / 9230614899

SPECIAL DISCOUNT UPTO **30%**

LADDER & SHOES RACK

MAT-X

MAT-X Large Step Ladder
& Slim Shoes Rack যা
অন্য কোথাও পাবেন না

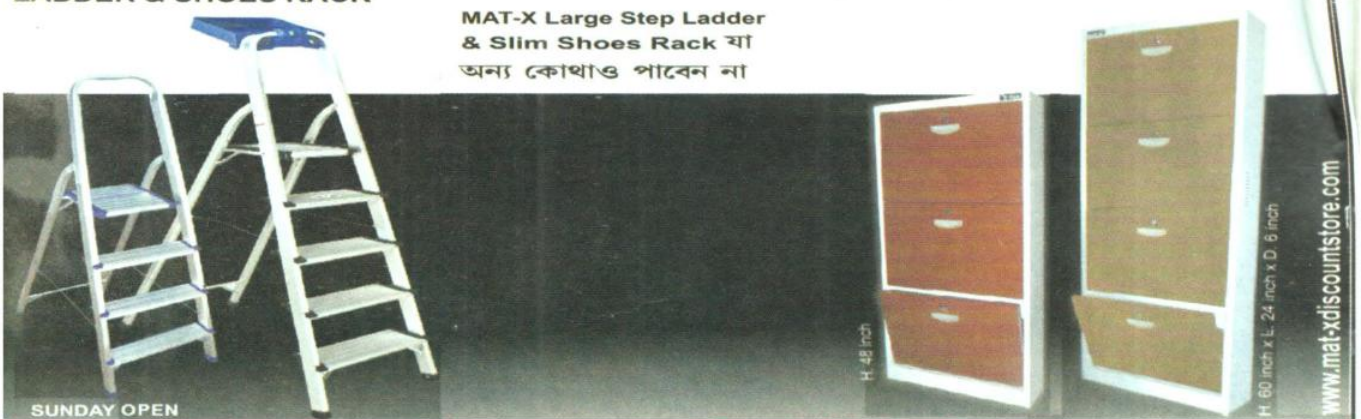

টাকা এবং টাইম বাঁচাতে রান্না করুন বৈদ্যুতিক কুকিং মেশিনে

রান্না করুন "বৈদ্যুতিক কুকিং মেশিনে" বৈদ্যুতিক কুকিং মেশিনের বিশেষত্ব

১ লিটার দুধ ঝটপট গরম করে দেয় মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে। কোনো অতিরিক্ত বাসন ছাড়াই সরাসরি রুটি ও পাঁপড় তৈরী করতে পারবেন মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে। মাত্র ৮ মিনিটে ভাত, ডাল, আলু সেদ্ধ তৈরী। ১ কেজি মাংস হতে সময় লাগে মাত্র ১২ মিনিট। গ্যাসের চাইতে ৫০% সস্তা ও ১০০% দ্রুত কাজ করে আর ১০০% সুরক্ষিত। ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট চললে বিদ্যুত খরচ মাত্র ১ ইউনিট (৪০০ ওয়াট) এতে বৈদ্যুতিক শক লাগার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন রকম ধোঁয়া না থাকায় বাসনে কালি পড়ে না। যন্ত্রটি এতটাই হাল্কা যে একে অফিস বা অন্যত্র যেখানে খুশি বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়। এতে আপনি যেকোন পাত্র ব্যবহার করতে পারবেন।

Ceramic Cooker All Dish

সারা বাংলায় Ladder & Shoes Rack এর ফ্রী হোম ডেমোর জন্য আজই ফোন করুন

Mob. : 9051681167 / 9007595617 / 9230614899

ফোন Busy থাকলে TYPE "MATX" SEND TO 56161 আমরা আপনাকে ফোন করে নেবো

আপনার যদি ১০০ Sq. ft. Shop থাকে তাহলে যোগাযোগ করুন MAT-X GALLERY জন্য আপনি Per Year প্রায় করতে পারেন ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা

খবর ৩৬৫ দিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

রবি

৭ জুলাই ২০১৩ । বর্ষ ২। সংখ্যা ২২

প্রচ্ছদ ৫

রূপান্তর

ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী। ঋতুপর্ণ ঘোষ আসলে মহিলা ছিলেন নাকি পুরুষ? মাইকেল জ্যাকসন নাকি ছেলে থেকে মেয়ে হয়েছিলেন? এমন আরও কত শত প্রশ্ন। সেইসব প্রশ্নের অন্বেষণে এবারের 'রবি'। লিখেছেন—

সৌগত রায় বর্মন, বিনোদ ঘোষাল, ড. পি যশ

ট্রান্সজেন্ডার তিস্তা মিত্রের সাক্ষাৎকার

গল্প ২২

এলভিস ও অমলাসুন্দরী
শমীক ঘোষ

ধারাবাহিক ১ ২৭

বানভাসি
সুব্রত সেন

কবিতা ৪৩

মলয় রায়চৌধুরীর ডেথ মেটাল

ধারাবাহিক ২ ৩৩

বসন্ত উৎসব
ঋতব্রত ভট্টাচার্য

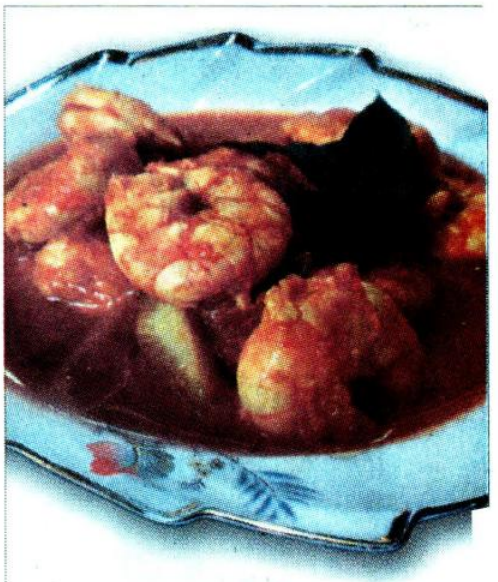

নিয়মিত বিভাগ

উদাসী বাবার আখড়া ৪৪
ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

অমিত্রাক্ষর ৫০

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ: আশিস চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক **পূষন গুপ্ত** । সহযোগী সম্পাদক **সুব্রত সেন**

রোজভ্যালি পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে পূষন গুপ্ত কর্তৃক ২ টেম্পল স্ট্রিট, তৃতীয় তল, কলকাতা - ৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদকীয় দফতর: সার্কুলার কোর্ট, ষষ্ঠ তল, ৮ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৭।

বিদ্রোহী কবি নজরুল আজও প্রাসঙ্গিক

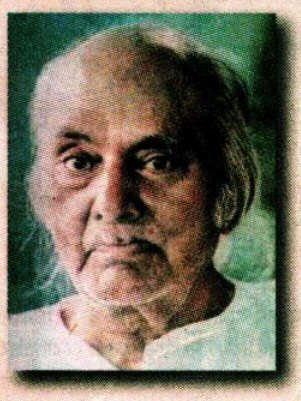

শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীদের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে ফুলের জলসায় যেন আমাদের নতুন করে আপ্লুত করল।

এ যুগের যশস্বী শিল্পীদের ভাবনাপ্রসূত লিখনীছটায় পরাধীন যুগের স্বাধীন কবি ও মরমী গীতিকার নজরুল 'রবি'র প্রচ্ছদে (২৬ মে) যেন মূর্ত হয়ে উঠলেন। 'চির উন্নত শির' বিদ্রোহী নজরুল আজও আমাদের চলনেবলনে বড়ই প্রাসঙ্গিক। হয়তো কালের অমোঘ নিয়মে আমরা সেই নজরুল ঝড়ে ততটা আজকাল ঝঞ্জাবিধ্বস্ত হই না, কিন্তু তাঁর স্থান হৃদয়ের মনিকোঠায় আজও অমলিন। এপার বাংলা রাবীন্দ্রিক ছায়ায় নজরুলকে ভুলে যেতে পারে কিন্তু ওপার বাংলা তাঁকে জাতীয় কবি'র সম্মানে লালনপালন করে চলেছে—যে কথা হৈমন্ত্রী শুক্লা তাঁর 'অঞ্জলি সহ মোর সঙ্গীতে'র মাধ্যমে সুন্দর ভাবনায় উপস্থাপিত করেছেন। এছাড়া গীতিকার নজরুলের চিরকালীন জনচিত্তজয়ী এক একটি বিখ্যাত গানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা কাব্যিক ভাবনা শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীদের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে ফুলের জলসায় যেন আমাদের নতুন করে আপ্লুত করল। 'রবি'র এই কবি প্রণাম সংখ্যা সংরক্ষণযোগ্য।

শুকুর আলি। চাকুন্দি। হুগলি।

নবীন লেখকদের লেখা মুগ্ধ করে

প্রতি রবিবার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকি 'রবি'-র নতুন সংখ্যার। ব্যক্তিগতভাবে আমি সাহিত্যের যে বিভাগটির বিশেষ অনুরাগী, সেটা 'ছোটগল্প'। তা নিয়ে দু-চারটে কথা বলবার জন্যেই এই চিঠি। আপনারা নতুন লেখকদের লেখা ছাপেন। দু-একটা বাদ দিলে বেশির ভাগ লেখাই তথাকথিত পুরোনো নাম নয়। এই একঝাঁক তরতাজা নতুনদের লেখা সত্যিই চমকে দেওয়ার মতো। প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই এই সব নতুন লেখকদের লেখা আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। বাংলা কথাসাহিত্যের গতিপথকে নতুন করে বুঝতে চাইলে এঁদের লেখা পড়তেই হবে। কত নতুন বিষয়, কত নতুন ভাষা, নতুন নতুন চরিত্র যে এঁদের কলমের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করছে! তথাকথিত 'হিট' নামের পিছনে না দৌড়ে আপনারা যে এঁদের লেখা ছাপছেন সেই সিদ্ধান্ত সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও এমন সব অনবদ্য লেখার অপেক্ষায় রইলাম।

বিশ্বব্রত আচার্য। মহেশতলা। কলকাতা-১৪১।

'বসন্ত উৎসব' সংক্রান্ত কিছু কথা

আমি রবি পত্রিকাটির একজন নিয়মিত পাঠিকা। আপনাদের 'বসন্ত উৎসব' ধারাবাহিকটি পড়ার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করি। যে কারণে আমার এই পত্রের অবতারণা, তা হল আপনার 'বসন্ত উৎসব' সম্বন্ধে একজন পাঠিকা হিসেবে আমি কিছু কথা বলা।

এই গল্পে অরণির চরিত্রটা বড় বেশি নিষ্প্রভ। কোন কিছুই সে তার স্ত্রীর দোষ দেখতে পায় না অথবা বুঝতে চেষ্টা করে না। কোনও কিছুতেই তার যেন কোনও হেলদোল নেই।

অনর্ঘ্যর প্রেমিকাকে তৃণাকে আমার মনে হয়েছে বড় বেশি নিষ্ঠুর। কিন্তু আমার মনে হয় সে তো অনর্ঘ্য বিবাহিত জেনেই জবরদস্তি অনর্ঘ্যর সঙ্গে প্রেমের খেলায় মত্ত হয়েছে। অনর্ঘ্য যখন তৃণাকে তার সমস্ত সত্তা, ভালোবাসা দিয়ে তাকে করিয়ে দিতে এল। তার বউয়ের কথা একবারও না ভেবে। তখন একজন এক পাঠিকা হিসেবে আমার মনে হয় তৃণার অনর্ঘ্যকে কড়া কথা বা অনর্ঘ্যর পৌরুষত্বে আঘাত লাগিয়ে ওইভাবে কথা বলা উচিত হয়নি। এখানে লিনার একাকিত্বটা বড় বেশি লেগেছে এবং চরিত্রটা বড় বেশি নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে। পাশাপাশি লিনার সঙ্গে অবিনাশবাবুর সম্পর্কটা আরও মজবুত দেখালে ভালো লাগত।

পাঠক হিসেবে আমি কখনওই কোনও লেখকের লেখার বা কল্পনার ওপর নিজের মতামত দিতে পারি না। কিন্তু এক্ষেত্রে ঋতব্রতর 'বসন্ত উৎসব' আমাকে এতটাই মোহিত করেছে যে, আমি একজন পাঠক হিসেবে উপন্যাসটার সম্পর্কে নিজের মূল্যায়ণ জানিয়েছি, যে আমার মনে হয় এই কারণগুলো থাকলে ভালো হত। ঋতব্রতর লেখা পড়ে ওনার সম্বন্ধে এই মনে হয়েছে যে, ওনার লেখা যথেষ্ট বলিষ্ঠ এবং প্রতিটা বিষয় সম্বন্ধে বক্তব্য অভিজ্ঞতার রসে সিক্ত। এবং ওনার জ্ঞানের ভাণ্ডারও বিশাল। আর হ্যাঁ শান্তিনিকেতনের প্রত্যেক জায়গা ও বিষয় সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা গেল ওনার লেখা থেকে। পরিশেষে বলি ঋতব্রতবাবুর 'বসন্ত উৎসব' পড়ার জন্য আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রইলাম।

সোহিনী চট্টোপাধ্যায়। বি টি রোড। কলকাতা-৩৬।

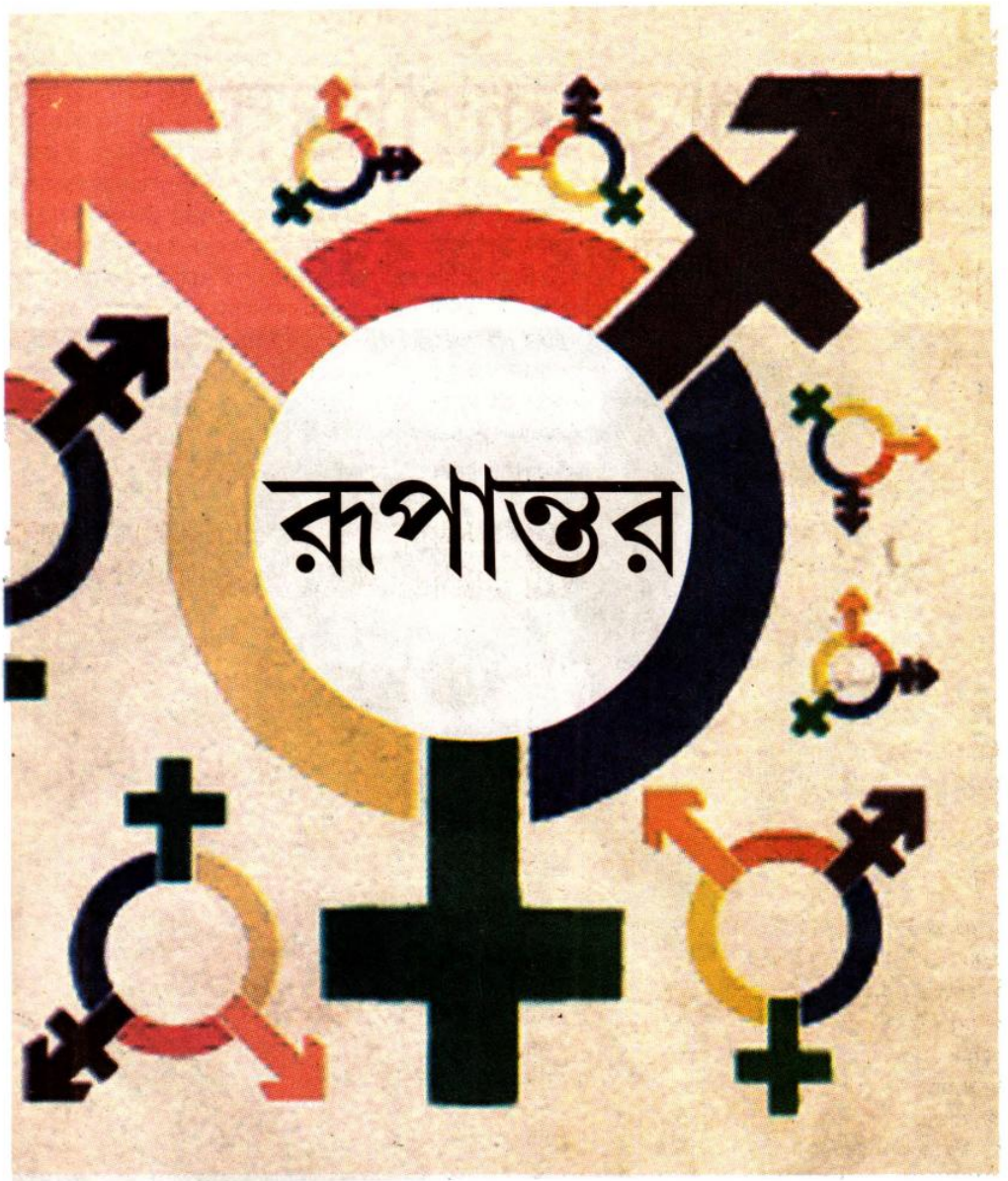

'রূপান্তর' শব্দটির বহু অর্থ হয়। রুমাল থেকে বিড়াল কিংবা জল থেকে বরফ—সবই রূপান্তর। ফ্রানৎস কাফকার 'মেটামরফোসিস' উপন্যাসের চরিত্র গ্রেগর পোকা হয়ে গেছিল। আমাদের 'রবি'-র বিষয় অবশ্য ব্যাপক অর্থে নয়। আমাদের বিষয় রূপান্তরকামিতা। আমদের মনুষ্য-সমাজে এমন অনেকেই রয়েছেন যাঁদের শরীরটি পুরুষের কিন্তু আত্মা এক নারীর। অপরদিকে কারও মন পুরুষের, কিন্তু শরীর নারীর। ইংরেজিতে এদের বলে ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী। সাধারণ মানুষের মনে এঁদের নিয়ে অল্প অথবা ভুল ধারণা রয়েছে অনেক। ঋতুপর্ণ ঘোষ আসলে মহিলা ছিলেন নাকি পুরুষ? মাইকেল জ্যাকসন নাকি ছেলে থেকে মেয়ে হয়েছিলেন? এমন আরও কত শত প্রশ্ন। সেইসব প্রশ্নের অন্বেষণে এবারের 'রবি'।

ঋতু রূপান্তর

সৌগত রায় বর্মন

ঋতুপর্ণ লিখছেন, 'চিত্রাঙ্গদা আমাদের এই সমস্ত প্রান্তিক মানুষদের অনেক-না-বলতে পারা কথার উচ্চারণ।'

ঋতু রূপান্তর সিনেমায় আত্মপ্রকাশ করল 'আরেকটি প্রেমের গল্প'তে। ছবিটি কিন্তু ঋতুপর্ণর নয়। তিনি অভিনয় করেছেন মাত্র। পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। বিতর্কিত। বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হল। কিন্তু কেউই এই সিনেমাটিকে অস্বীকার করতে পারল না। কেননা এখন সময়টা বদলে গেছে। সমকাম নিয়ে সিনেমা, গল্প বা উপন্যাসকে কেউ বুক বাজিয়ে আর 'অশ্লীল' বা 'কুরুচিকর' বলতে পারবে না। কাম-সমস্যার মতোই সমকাম একটা সমস্যা। শুধু সমস্যাই বা বলি কেন, গভীরতম সমস্যা। এতদিনে শিক্ষিত সমাজ তা উপলব্ধি করেছে।

এ ক্ষেত্রে স্বয়ং ঋতুপর্ণর ভাষ্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে, 'এই বার সেই কঠিনতম অধ্যায়। ঋতুপর্ণ পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে পরপর তিনটে ছবিতে পৃথিবীর মূলধারার অন্যতম গোপন সিন্দুকটা খুললেন, যার নাম সমকাম। ...সবথেকে নিরাশ হলেন বাংলার মার্কসবাদী বিদগ্ধ বিশিষ্টরা এবং আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, এই অগ্রদূতরা, যাঁদের আমরা নানাভাবে সমাজ বদলানোর কথা বলতে শুনেছি, বিকল্প যৌনতার সামনে এসে তাঁরা আসলে যে কী করুণভাবে চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী এবং রক্ষণশীল। তাঁদের সমস্ত প্রতিবাদই কেবল অর্থনৈতিক অসাম্যের,গণতন্ত্রের এবং ধর্মনিরপেক্ষতার। তাঁদের বিপ্লবের মধ্যে যৌনতার স্থান নেই কোথাও।' এই লেখাটি ঋতুপর্ণ যখন লেখন তখন 'মেমোরিজ ইন মার্চ' এবং 'চিত্রাঙ্গদা' শেষ হয়ে গেছে।

এই উপরিউক্ত প্রতিবেদনের মূল সুরের একটা শুরু আছে নিশ্চয়ই। সেই শুরুটা অবশ্যই 'আরেকটি প্রেমের গল্প'। ছবির গল্পটি এরকম, দিল্লি থেকে কলকাতা এসেছেন একজন ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার। সঙ্গে সিনেমাটোগ্রাফার বন্ধু। তারা ৫০-এর দশকের একজন থিয়েটার অভিনেতাকে নিয়ে একটা তথ্যচিত্র তৈরি করছেন। এই অভিনেতার নাম চপল ভাদুড়ি। একটু বোধহয় ভুল বলা হল। অভিনেতার শিরোপা চপল ভাদুড়ি পাননি। তিনি অভিনেত্রী। সেই সময় কোনও ভদ্রঘরের মহিলা থিয়েটার করতে যেতেন না। ফলে নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন পুরুষরাই। যারা বয়স্ক তাদের নিশ্চই মনে আছে ছোটবেলায় দেখা যাত্রাগুলো। যেমন, সীতা, বেহুলা, মনসা, দুর্গা চরিত্রে। 'অভিনেত্রী'রা মঞ্চের বাইরে গ্রিনরুমে এসে বিড়ি খেতেন অথবা খৈনি। তাদের দেখে হাসি পেত, মজা করতাম। জানতাম না এই হাসি-মশকরার আড়ালে লুকিয়ে আছে বেদনার গাঢ় অন্ধকার। একজন পুরষ হয়ে জন্ম নিয়েও তাঁদের সহ্য করতে হত 'মেয়েলি' টিটকিরি। চপল ভাদুড়িও তাই। কিন্তু তবুও তাঁর নাম ইতিহাসে লগ্ন হয়ে আছে। অসাধারণ অভিনয়ের জন্য। ১৯৫৫ সালে তাঁর অভিনীত প্রথম থিয়েটার 'আলিবাবা'। অবশ্যই মর্জিনা চরিত্রে। তারপর 'সুলতানা রিজিয়া', 'চাঁদ বিবি', 'মহিয়ষী কৈকেয়ী' ইত্যাদি। চপল হয়ে উঠলেন 'চপলরানি'। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা ভালো। নিজের জন্মগত আইডেন্টিটি ভুলে গিয়ে, ঠিক বিপরীতাত্মক চরিত্রে অভিনয় করা সহজ কথা নয়। অসাধ্য। সেই অসাধ্যকে জয় করেছিলেন চপল। সমস্ত রকম সামাজিক সংস্কারকে দূরে রেখে। 'আরেকটি প্রেমের গল্প'তে কৌশিক সম্ভবত ঋতুপর্ণকে মাথায় রেখেই এই ছবির পরিকল্পনা করেন।

'আরেকটি প্রেমের গল্প' সার্থক অর্থেই ঋতুময় হয়ে উঠল। এই ধরনের সাহসী বিষয় নিয়ে ছবি করার চিন্তার জন্যই কৌশিককে ধন্যবাদ। ঋতুপর্ণর অভিনয় দেখতে দেখতে বার বার বোঝা গেছে ঠিক কোন আর্তি থেকে এই ছবিটিতে তিনি অভিনয় করেছেন। চপল ভাদুড়ির চরিত্রে ঋতুর উপস্থিতি তাঁর বায়োগ্রাফির প্রথম অধ্যায়।

এখানে সিনেমাটোগ্রাফার ইন্দ্রনীল কিন্তু বাই সেক্সুয়াল। ইন্দ্রনীল দুটি সমান্তরাল সম্পর্ক বজায় রাখেন। একদিকে তাঁর স্ত্রী চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়, অন্যদিকে ঋতুপর্ণ। ছবিটি শুধু একটা কাহিনি, যে কাহিনি এখনও সমাজে স্বীকৃত নয়। সমকামিতা নিয়ে ভারতের সনাতন ধর্ম পরিষ্কার করে কোনও সিদ্ধান্তও জানায়নি। সমকামিতা বৈধ নয়, আবার অবৈধও নয়। সমকামী বিবাহ নিয়ে হিন্দু ধর্ম তিনটি শর্ত আরোপ করেছে। এক প্রজা, দুই ধর্ম ও তিন রতি। প্রজা অর্থে প্রজনন অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন ও বংশরক্ষা। ধর্ম অর্থে একে অপরের দায়িত্ব গ্রহণ। এবং রতি অর্থে প্রেম, ভালোবাসা এবং অবশ্যই যৌনতা। দু'জন সমকামীর মধ্যে ভালোবাস থাকবে, না যৌনতা, এ কথার কোনও মানে নেই। দু'জন সমকামী একে অপরকে ভালোবেসে দীর্ঘদিন একসাথে সুখে বসবাস করছে তার ডজন

এ ক্ষেত্রে স্বয়ং ঋতুপর্ণর ভাষ্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে, 'এই বার সেই কঠিনতম অধ্যায়। ঋতুপর্ণ পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে পরপর তিনটে ছবিতে পৃথিবীর মূলধারার অন্যতম গোপন সিন্দুকটা খুললেন, যার নাম সমকাম।

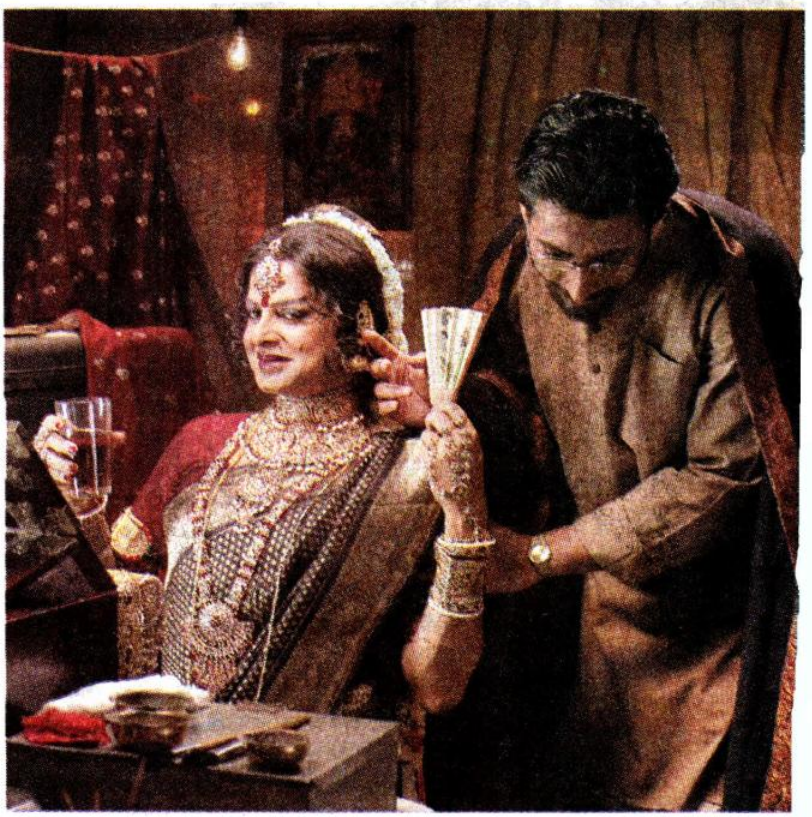

'আরেকটি প্রেমের গল্প' ছবিতে ঋতুপর্ণ ঘোষ ও ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

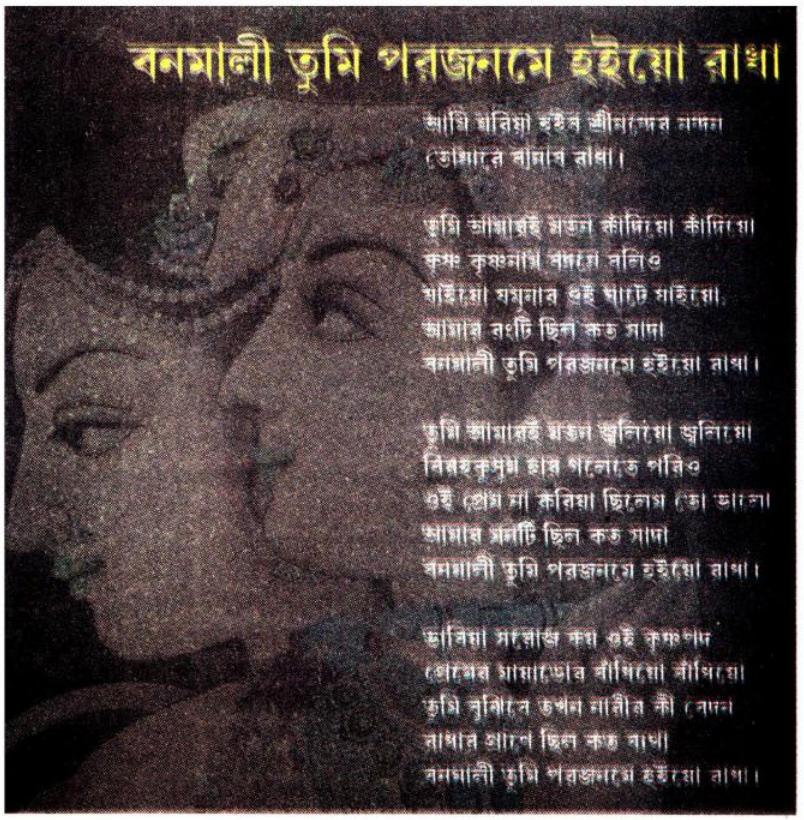

ডজন উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সমকামী বিবাহে আমরা একটা মাত্র কিস্তিতে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছি। তা হল, প্রজনন। সমকামীরা আর যাই করুক সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা তাদের নেই। প্রকৃতি তাদের এই অধিকার দেয়নি। ঠিক এই সমস্যাটা কেউ সেভাবে লক্ষ করে না। 'আরেকটি প্রেমের গল্প'তে কিন্তু,স্পষ্টত-অস্পষ্টভাবে হলেও, সমস্যাটা আছে। ইন্দ্রনীলের বাবা হবার সংবাদে ঋতুপর্ণর খুশি হবার কোনও কারণ নেই। যৌন ঈর্ষা সমকামীদের মধ্যে নেই, এই কথা নিশ্চই স্বীকার্য নয়। প্রেম, ভালোবাসা ও যৌনতার ক্ষেত্রে ঈর্ষা ভয়ানক স্পর্শকাতর বিষয়। শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের অক্ষমতাই চিড় ধরায় ঋতুপর্ণ ও ইন্দ্রনীলের মধ্যে। ফলে ক্রমশ একা হয়ে যায় ঋতু। এই একাকিত্ব কিন্তু ছবিটির শেষকথা। মূল সুর।

রূপান্তরের দ্বিতীয় পর্ব 'মেমোরিজ ইন মার্চ' প্রায় একই ঘরানার। এই ছবিটিও কিন্তু ঋতুপর্ণর নয়। সঞ্জয় নাগের। যদিও চিত্রনাট্য ও অবশ্যই অভিনয়ে ঋতুপর্ণ স্বয়ং। 'মেমোরিজ ইন মার্চ'ও ঋতুপর্ণময়। ঠিক যেমন তাঁর ন্যারেটিভ, তাঁর আবহ, এমনকী যাকে সিনেমাটিক বলে, তাও। এ ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠতে পারে, ঋতুপর্ণ নিজে কেন এই 'অতি ব্যক্তিগত' বিষয় নিয়ে ছবি করছেন না? তিনি কি তখনও অবধি বুঝে উঠতে পারেননি, সম্যসার মূল কোথায় লুকিয়ে আছে? পরপর দুটো ছবিতে তিনি থেকেও নেই। এই ছবিগুলো ইতিহাসে কখনোই ঋতুপর্ণ ঘোষের 'ব্যক্তিগত' ছবি হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। তবে? আসলে ঋতুপর্ণ বোধহয় এই বিষয় নিয়ে একটা অন্তিম পরিণতির কথা ভেবে রেখেছিলেন। যে পরিণতি তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর শেষ সম্পূর্ণ ছবি 'চিত্রাঙ্গদা'য়।

আবার ঋতুপর্ণ উদ্ধৃতিই দিতে হচ্ছে। তিনি লিখছেন, ''চিত্রাঙ্গদা' আমাদের এই সমস্ত প্রান্তিক মানুষদের অনেক-না-বলতে পারা কথার উচ্চারণ।' এই উচ্চারণই বুঝিয়ে দেয় সমকামিতা তাঁর কতটা 'ব্যক্তিগত'। এতদিন যা ছিল অস্পষ্ট, স্পষ্টতই তাকে প্রাকশ্যে আনলেন তিনি। নিজেকে প্রান্তিক বলার মধ্যে দিয়েই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, এবার তিনি নিজের কথা, নিজের ছবিতেই বলবেন। ফলত 'চিত্রাঙ্গদা' হতে পারে তাঁর আত্মজৈবনিক প্রকাশনা।

ঋতুপর্ণই নয়, সিনেমা বা যে কোনও শিল্প মাধ্যমই পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে শিল্পীর আত্মকথা। স্রষ্টা যদি নিজেকে প্রকাশই না করবে, তবে তার কী দায় সৃষ্টিতে? ঋতুপর্ণও এই শেষ সম্পূর্ণ ছবিতে তাকে হাজির করেছেন নির্মমভাবে। তাঁর অকালপ্রয়াণ সমাপতন। কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি, 'ব্যক্তিগত' প্রকাশ্যে আসার পরই, ছবির জগৎ থেকে তাঁকে চিরবিদায় নিতে হবে।

সত্যজিৎ রায় তাঁর শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এ আত্মজৈবনিক। যার শুরু হয়েছিল 'গণশত্রু' থেকে। মাঝে 'শাখাপ্রশাখা'। তাঁর এই শেষ তিনটে ছবিতেই তিনি সামাজিক অবক্ষয়, দুর্নীতি, মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সরাসরি। অর্থাৎ ডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচ। কোনওরকম 'সিনেমাটিক' কলা কৌশলের তোয়াক্কা না করেই। সত্যজিৎ-এর শেষ তিনটি ছবি, যা তাঁর সিনেমা ভাবনার সঙ্গে কোনওমতেই যায় না, তা তিনি কেন আমাদের উপহার দিলেন? একটাই কারণ, যা কিছু তাঁর বলা বাকি ছিল তাই তিনি সরাসরি বলতে চেয়েছেন দর্শকদের কাছে। 'আগন্তুক'-এ নিজের গলায় গান, তাঁর সিগনেচার বা স্বাক্ষর।

একইরকমভাবে বলতে হয় ঋত্বিক ঘটকের কথা। তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'। আত্মকথন সরাসরি। নিজে নিজের চরিত্রে অভিনয় করে যা যা বলা দরকার এবং জরুরি তা তিনি বলেছেন তাঁর ঘরানায়। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' নিশ্চয়ই আগমী শতকেও শ্রেষ্ঠ ছবির শিরোপা পাবে।

আবার কুরোশাওয়া তাঁর শেষের আগের ছবি 'ড্রিমস' সিরিজে ছোট ছোট উপচলচ্চিত্রে বলেছেন সভ্যতার সঙ্কটের কথা, যা ভীষণভাবে জরুরি এবং জরুরি। এই সিরিজেও তাই কুরোশাওয়া কোনওরকম 'সিনেমাটিকস'-এর ধার ধারেননি।

ইতিহাসে লেখা থাকবে ঋতুপর্ণর শেষ ছবি 'সত্যান্বেষী'। কিন্তু এই ছবিটি তাঁর ব্যক্তিগত আত্মকথন নয়। সম্পূর্ণ তো নয়ই। কেননা এই ছবির সমাপ্তি হবে তাঁর কলাকুশলীদের হাতে। নিশ্চয়ই আমরা এক আলাদা ধরনের ব্যোমকেশকে পাব। বক্স অফিসে উপচে পড়বে মানুষ। তবুও তাঁর শেষ সম্পূর্ণ ছবি 'চিত্রাঙ্গদা' যেখান তিনি নিজেকে পর্দায় হাজির করেছেন কোনওরকম রাখঢাক না করে। প্রকাশ্যে। তা সে যতই নির্মম হোক না কেন।

ঋতুপর্ণই নয়, সিনেমা বা যে কোনও শিল্প মাধ্যমই পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে শিল্পীর আত্মকথা। স্রষ্টা যদি নিজেকে প্রকাশই না করবে, তবে তার কী দায় সৃষ্টিতে? ঋতুপর্ণও এই শেষ সম্পূর্ণ ছবিতে তাকে হাজির করেছেন নির্মমভাবে।

প্রান্তিক মানুষ বলতে তিনি নিজেকেই চিহ্নিত করেছেন। অস্বীকার করেননি। একটা যন্ত্রণা তাঁর মধ্যে ছিলই এবং এই যন্ত্রণা বোধ থেকে মুক্তির জন্যই তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা'। তাঁর নিজের লেখা থেকে একটা অংশ তুলে ধরলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। 'গতবছর আগস্ট মাসে চিত্রাঙ্গদা মুক্তি পেল কলকাতার প্রেক্ষাগৃহে। অল্প কিছু মানুষের খুব ভালো লেগেছিল, তাঁরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, একদল আবার ছবি দেখে গুম হয়ে গিয়েছেন। আর বেশিরভাগ মানুষই বিষয় বিতৃষ্ণা থেকে ছবিটি দেখতেই যাননি। আজ জাতীয় পুরস্কারের স্বীকৃতির কারণে যত 'এসএমএস' বা অভিনন্দন পাচ্ছি, তার ক্ষুদ্র একটি সংখ্যাকেও যদি দর্শক সংখ্যার প্রতিনিধি বলে ভাবতে পারতাম, তাহলে 'চিত্রাঙ্গদা'কে কয়েক সপ্তাহ মাছি তাড়িয়ে উঠে যেতে হত না।' তাঁর বক্তব্য খুব পরিষ্কার, সমকামিতা এমন একটা বিষয় এবং চিত্রাঙ্গদায় তা যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাকে সহ্য করার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই আছে।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'কে আমরা পড়েছি। শুনেছি। দেখেওছি। কিন্তু ঋতুপর্ণর মতো করে তাকে তো ভাবিনি। কুরূপা আর সুরূপা একই দেহে অবস্থিত। এই বিপরীত সত্তার সঙ্ঘাতের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তৎকালে রবীন্দ্রনাথ যা প্রকাশ্যে বলতে পারেননি তাই বলে দিয়েছেন ঋতুপর্ণ।

আগের দুটো ছবির মতোই এখানে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে একজন হোমোসেক্সুয়াল ও বাইসেক্সুয়ালের মধ্যে। জিশু সেনগুপ্ত ওরফে পার্থর সঙ্গে রুদ্র বা ঋতুপর্ণর সমকামী সম্পর্কের পাশাপাশি আছে আরও একটা সম্পর্ক। পার্থর সঙ্গে কস্তুরি বা রাইমার। দুটি দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ককে কীভাবে প্রকাশিত করা যায় তা ঋতুপর্ণ জানেন।

কেন আগের দুটি ছবিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেও তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' করলেন, তার সম্ভবত একটাই উত্তর। আগের ঋতুপর্ণ কখনোই পরিবর্তিত হবার কথা বলেননি। একমাত্র এই ছবিটিতেই তিনি পরিবর্তিত হতে চেয়েছেন। কুরূপা থেকে সুরূপায়। মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে চরম পন্থায়। অর্থাৎ সহাবস্থান নয়। একটাই অবস্থান। চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অন্য ছবির পার্থক্য এখানেই। তাঁর ব্যক্তিগত আর্তি এখানে পরিস্ফুট। একটা বদলের ইঙ্গিত তিনি রেখে গেছেন। সাফল্য-অসাফল্যর প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এই চাহিদাটাই 'চিত্রাঙ্গদা'। ঋতু রূপান্তরের এক নির্মম কাহিনি। এক সত্তা থেকে আরেক সত্তায় যাত্রা খুব সহজ কাজ নয়। আর তার জন্যই 'চিত্রাঙ্গদা' ভারতীয় সিনেমায় ল্যান্ডমার্ক। সাহসী ঋতু পরিবর্তনই চিত্রাঙ্গদার সারকথা।❖

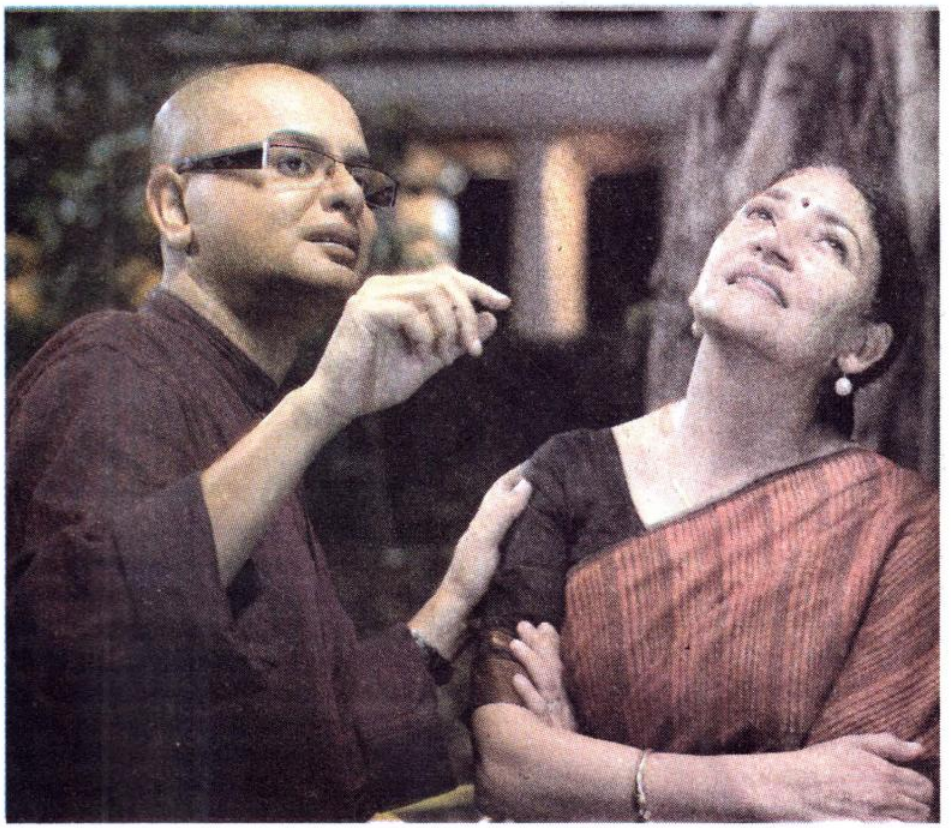

'মেমরিজ ইন মার্চ' ছবিতে ঋতুপর্ণ ঘোষ ও দীপ্তি নাভাল

ইতিহাসে লেখা থাকবে ঋতুপর্ণর শেষ ছবি 'সত্যান্বেষী'। কিন্তু এই ছবিটি তাঁর ব্যক্তিগত আত্মকথন নয়। সম্পূর্ণ তো নয়ই। কেননা এই ছবির সমাপ্তি হবে তাঁর কলাকুশলীদের হাতে।

তিস্তা মিত্র একজন ট্রান্সজেন্ডার।

একজন নারী। একজন কবি, একজন অভিনেত্রী, লিঙ্গান্তরকামীদের একটি কনসালট্যান্সি সংস্থার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যান্ড কাউন্সেলর। এই প্রথম নিজের জীবন, লড়াই, রূপান্তর এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে অকপটে জানালেন অনেক অনেক কথা। শুনলেন বিনোদ ঘোষাল।

বড় হয়ে মায়ের কাছে শুনেছি আমার জন্মটাকেও নাকি আটকানোর চেষ্টা হয়েছিল। কারণ দারিদ্র্য। গরিবের সংসারে আবার একটি সন্তান আমার মা-বাবা কেউই চাননি। সুতরাং আমাকে পৃথিবীর অলো দেখাতে সুযোগ না দেওয়ার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। তবু তাদের সব চেষ্টাকে হারিয়ে দিয়ে আমি জন্মেছিলাম। তাই আমার জীবনের প্রথম দিন থেকেই লড়াই শুরু। জন্মালাম একটা ছেলের শরীর নিয়ে। কিন্তু বছর কয়েক পরেই আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না কেন বাড়ির সবাই আমাকে ছেলে ভাবে। আমি তো একটা মেয়ে। আমি কিছুতেই নিজেকে একটা মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতাম না। শরীর একটা ছিল বটে ছেলেদের, কিন্তু আমার মন আত্মা সবই তো মেয়ের। সেকথা শুধু আমি ফিল করতে পারতাম। আর কেউ না। কেউই না। তখন বয়সে ছোট, অতশত কিছু বুঝিও না, কিন্তু এইটুকু শুধু বুঝতাম যে আমি মায়ের মতো, বাবার মতো একটুও না। আমার এমন আচরণে বাড়ির লোকে একটু ঘাবড়াল। তারপর ভাবল ছেলেদের ইস্কুলে কিছুদিন পড়লে আমার এইসব ভীমরতি ঠিক হয়ে যাবে। তখন আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কারও কাছে কোনও দাম নেই। আমাকে ভর্তি করে দেওয়া হল পাড়ার একটা কো-এড ইস্কুলে। আমাকে জোর করে ছেলেদের মতো শার্ট-প্যান্ট পরিয়ে স্কুলে পাঠালেও আমি কোনওভাবেই ছেলেদের মধ্যে নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারতাম না। বরং মেয়েদের মধ্যেই মনে হত আমি অনেক সহজ, স্বাভাবিক। স্কুলে ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা টয়লেট ছিল। ছেলেদের টয়লেটে যেতে আমার লজ্জা করত খুব। খুব লজ্জা। একদিন সেই লজ্জা আর সামলাতে না পেরে মেয়েদের টয়লেটেই ঢুকে পড়লাম। গোটা স্কুলে হুলুস্থুলু কাণ্ড। আমি নাকি ভয়ংকর অন্যায় করেছি, ছেলে হয়ে মেয়েদের টয়লেটে ঢুকে। শাস্তি পেলাম। কিন্তু কাউকে বোঝাতেই পারলাম না, আমিও তো একটা মেয়ে। আমার শরীরে কী রয়েছে তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। আমার মন, আত্মা পুরোটাই মেয়ের। ভগবান আমাকে এইভাবেই পাঠিয়েছেন। আমার কী দোষ? কেউ বুঝল না আমাকে। আমি শরীরে কী সেটাই সকলের কাছে প্রধান। আমি কী সেটা শুধু স্কুল কেন আমার মা-বাবাও বুঝতে পারত না। হয়তো বুঝেও বুঝতে চাইত না, কোন বাবা-মা মেনে নিতে পারে তার হিজড়ে ছেলে কিংবা মেয়েকে? আমি তো তাই। তখনও বুঝতে পারিনি, মানুষের দু'পায়ের ফাঁকে কী চিহ্ন আছে সেটাই মানুষের আসল পরিচয়। বাকি সব মিথ্যে।

ক্লাস ফোর পর্যন্ত এইভাবেই কাটল। তারপর যেটা ঘটল তা আরও ভয়ঙ্কর। কো-এড স্কুল ছেড়ে আমাকে ভর্তি হতে হল পুরোপুরি বয়েজ স্কুলে। সে যে কী দুর্বিসহ দিনগুলো! আমাদের বয়েজ স্কুলের লাগোয়া ছিল গার্লস স্কুল। দুই স্কুলের মাঝখানে ছিল একটা খুব নিচু পাঁচিল। সেই পাঁচিলের ওপর দিয়ে একটা কাঠবিড়ালি সারাদিন এপার ওপার করত। আমি ক্লাসরুমে জানলার পাশে বসে সারাদিন তাকিয়ে থাকতাম সেই গার্লস স্কুলের দিকে। আর কাঠবিড়ালিটাকে দেখে ভাবতাম ও আসলে আমারই একটা রূপ। যে বারবার এদিক আর ওদিক করছে।

আমি গার্লস স্কুলের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম ওই ক্লাসরুমগুলোই তো আমার আসল ক্লাসরুম হওয়া উচিত। আমি কেন এখানে? আর বয়েজ স্কুলের টিচাররা ভাবত আমি আসলে একটি অসভ্য ইতর ছেলে, যে এই বয়সেই সারাদিন মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ফলে পুরো বিষয়টাই মিস ইন্টারপ্রেট হত। আমি তাকিয়ে থাকতাম এক কারণে আর টিচাররা ভাবত অন্য কারণ। আমি তো মেয়ে, ওই স্কুলে পড়ার কথা। কেন এখানে রেখেছে আমাকে? কেউ শুনত না, কেউ বুঝত না। বাড়িতে নালিশ গেল একদিন। টিচারদের অভিযোগ শুনে বাবা-মা আমার প্রতি তো রাগলেনই না, উপরন্তু খুশি হলেন এই ভেবে যে আমি যখন মেয়েদের দিকে তাকাই তার মানে আমি আসলে ছেলেই। শান্তি শান্তি। হায় শান্তি! কী আসল কারণ আর তারা কী বুঝে বসলেন। আসলে এখন বুঝি কোন বাবা-মা চায় তার জন্ম দেওয়া ছেলে বা মেয়েকে কেউ 'হিজড়ে' বলুক।

এইভাবেই চলতে থাকল। একটার পর একটা ক্লাস পেরোতে থাকলাম আর যত বড় হতে থাকলাম মনের কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র রাগ, অপমানবোধও তৈরি হতে থাকল আমার, ভেতরে ভেতরে। আমি নিজেকে যা বিশ্বাস করি তা কেন আমাকে হতে দেওয়া হবে না? কী দোষ আমার? আমি তো চুরি করি না। কাউকে সামান্যতম আঘাতও করি না। তাহলে সবাই কেন আমাকে এত ছোট করে সকলের সামনে? আমি যেন একটা মানুষই নয় এমনটাই ভাবে সবাই। ক্লাসের ছেলে বন্ধুরা আমি আসলে ছেলে না মেয়ে তা শরীর দিয়ে বুঝে নিতে চেষ্টা করে বারবার। আমি নিজের সাধ্যমতো প্রতিবাদ করি। কেউ শোনে না। চিৎকার করে বলি আমি একটা মেয়ে, মেয়ে-মেয়ে। তোমরা যতই ভাবো আমি ছেলে, আমি তা নই। আমার কথা শুনে সবাই হাসে, টিটকিরি দেয়।

এই অপমান হজম করতে করতে একদিন আমি সত্যিই ফেটে পড়লাম। সালোয়ার কামিজ পরে সটান হাজির হলাম আমার বয়েজ স্কুলে। আমার প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ। হুলুস্থুলু কাণ্ড হল। স্কুল-পাড়া জুড়ে ছিছিক্কার। আমি নাকি অমানুষ। ইচ্ছে করে শয়তানি করছি। অন্য মতলব রয়েছে। কেউ আবার বলল, না না, শয়তানি নয়, ওর ঘাড়ে কোনও পেত্নি চেপেছে। ভালো একটা ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁক করালেই সব সেরে যাবে। সে সব কিছুই হল না। কিন্তু যেটা হল স্কুলের বন্ধুরা, টিচাররা বোধহয় ফিল করলেন, নাহ্, আমার মধ্যে মেয়ে হওয়ার ভান নেই। আমি হয়তো সত্যিই অন্যরকম কিছু একটা। নইলে শুধুমাত্র শয়তানির কারণে এতটা সাংঘাতিক কাজ ঘটিয়ে ফেলতে পারতাম না। সেদিনের পর থেকে আমাকে সত্যিই একটু সমঝে চলতে শুরু করল সকলে। আর আমিও চলতে পারতাম আমার মতো। অনেকটা। কিন্তু এর মধ্যেই আমাকে নিয়মিত যেতে হত কাউন্সেলিং-এর জন্য। ডক্টররা দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমাকে কাউন্সেলিং করতেন, বুঝে নিতে চেষ্টা করতেন আমি কে? ছেলেলি মেয়ে? নাকি মেয়েলি ছেলে? কোনটা? আমি তাদের সামনে বসলেই ভীষণ গুটিয়ে যেতাম। ইচ্ছে করত না তাদের সামনে নিজেকে মেলে

এই অপমান হজম করতে করতে একদিন আমি সত্যিই ফেটে পড়লাম। সালোয়ার কামিজ পরে সটান হাজির হলাম আমার বয়েজ স্কুলে। আমার প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ। হুলুস্থুলু কাণ্ড হল। স্কুল-পাড়া জুড়ে ছিছিক্কার।

শুরু থেকেই কলেজে সহপাঠী আর শিক্ষকদের নিচু নজরে পড়ে গেছিলাম আমি। আমি কেন প্রচলিত ছেলে-মেয়েদের থেকে একটু অন্যরকম? যদিও আমার শুঁড় নেই। আমারও মানুষের মতোই হাত-পা-মুখ -চোখ-কান।

ধরতে। কারণ মনে হত এরাও কেউ বুঝবে না আমাকে। আমার বাবা-মাই বোঝেন না যখন। বাড়িতে সারাক্ষণের অশান্তি, পাড়ার লোকের পরোক্ষে নির্যাতন, রাস্তা-ঘাটে হিউমিলিয়েশনের চূড়ান্ত। একেক সময় মনে হত আর বুঝি পারব না একা লড়াই করতে। হেরে যাব। কিন্তু সব সময় আমাকে ভরসা দিতেন ওই দাড়িওলা বুড়ো। রবীন্দ্রনাথ। কী অসম্ভব যে শক্তি পেয়েছি আমি ওঁর লেখা থেকে! তাই হেরে গিয়ে হাত তুলে দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তেই মনে হত, নাহ্... হারব না। শেষ দেখে ছাড়ব। মাথা উঁচু করে আমিও একদিন বাঁচবই সবার সঙ্গে। আর তার জন্য সবার আগে যেটা প্রয়োজন তা হল শিক্ষা, ডিগ্রি। সেটা আমাকে যে করে হোক পেতেই হবে। সেই জেদের বশেই দাঁত কামড়ে পড়ে থেকে

মাইকেল জ্যাকসন, যেমন ছিলেন

হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে ফেললাম একসময়। হ্যাঁ একটা ছেলের পরিচয়েই। যা আমি আদৌ নই। কিন্তু উপায় কী?

ভর্তি হলাম কলকাতার একটি নামকরা কলেজে। স্কুল তবু নিজের পাড়ার ছিল। আমাকে ছোট্ট থেকে এমনটা দেখতে দেখতে খানিকটা হলেও সয়ে গেছিল সবারই। কিন্তু কলেজে যখন ঢুকলাম তখন সকলের কাছে আমি যেন একটা আজব চিড়িয়া। যাকে নিয়ে স্রেফ তামাশা করা যায়, অকারণে অসভ্যতা করা যায়, এমনকী গোপনে খানিকটা যৌনতা...হ্যাঁ, তার চেষ্টাও করা যায়। কিন্তু বন্ধু বলে ভাবা যায় না কখনওই। শুরু থেকেই কলেজে সহপাঠী আর শিক্ষকদের নিচু নজরে পড়ে গেছিলাম আমি। আমি কেন প্রচলিত ছেলে-মেয়েদের থেকে একটু অন্যরকম? যদিও আমার শুঁড় নেই। আমারও মানুষের মতোই হাত-পা-মুখ-চোখ-কান। কথাও বলি মানুষের ভাষায়। তবু, তবু, তবু আমি যেন মানুষ না। ভিনগ্রহের কোনও প্রাণী। আমি কলেজে ভোট দিতাম না, কারণ আমার মনে হত যেখানে আমার বেঁচে থাকাটাই সিকিওর নয় সেখানে ভোট দেওয়াটা একটা প্রহসন মাত্র। তাছাড়া ইউনিয়নের লিডারদের তেল দিতাম না। যে কোনও অন্যায়ের সোচ্চার প্রতিবাদ করতাম। ফলে কলেজটায় আর পারলাম না টিকতে। আমার ওপর অত্যাচার বাড়তে বাড়তে শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে আমাকে পরীক্ষাই দিতে দেওয়া হল না ষড়যন্ত্র করে। বাধ্য হয়েই ছাড়তে হল সেই কলেজটা।

তখন আমি কী করব জানি না। পুরো দিশেহারা অবস্থা। তাহলে কি পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হবে আমাকে? শেষ চেষ্টা হিসেবে দ্বারস্থ হলাম কলকাতারই একটি ইতিহাস বিজরিত অত্যন্ত নামী গার্লস কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে। পৃথিবীতে শুধু খারাপ মানুষ নেই, অসংখ্য ভালো মানুষও রয়েছেন। আর তাদের জন্যই এখনও নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। আমি তাঁকে সবটা জানালাম। তিনি শুনলেন। তারপর বললেন, যেহেতু এটা একটা গার্লস কলেজ এবং তখনও যেহেতু আমার জেনিটাল কনভারশন হয়নি, তাই অন্তরে মেয়ে হলেও বাইরেটা তো সকলে দেখে। সুতরাং আইনের চোখে তখনও আমি একজন ছেলে। তাই রেগুলার স্টুডেন্ট হিসেবে আমি সেই কলেজে অ্যাডমিশন পাব না।

তাহলে উপায়?

উপায় তিনিই বাতলালেন। বললেন, আমি যদি করেস্পন্ডেন্সে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করতে চাই তাহলে তিনি ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। রাজি হয়ে গেলাম এক কথায়। অ্যাডমিশন ফর্মে মেল অর ফিমেল দুটো অপশনের কোনওটাতেই টিক দিইনি। তবে ইউনিভার্সিটি কর্তার আমার সেই সময়ের অফিসিয়াল পুরুষ নাম দেখে ভেবেছিলেন আমি হয়তো সত্যিই একজন পুরুষ। ভর্তি হয়ে গেলাম। ফিলোজাফি নিয়ে গ্র্যাজুয়েটও হয়ে গেলাম একদিন। আমার আরেক জয়।

কিন্তু তাই বলে সমাজ কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেয়নি। পাড়ায় আমার পাশের বাড়িতেই বাংলাদেশ থেকে আসা একটা ফ্যামিলি ছিল। সেই ফ্যামিলির মেয়ে ছিল দেবশ্রী। আমারই বয়সি। আমার ছোট্টবেলার বন্ধু।

মাইকেল জ্যাকসন, যেমন হলেন

শেষ চেষ্টা হিসেবে দ্বারস্থ হলাম কলকাতারই একটি ইতিহাস বিজরিত অত্যন্ত নামী গার্লস কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে। পৃথিবীতে শুধু খারাপ মানুষ নেই, অসংখ্য ভালো মানুষও রয়েছেন।

একমাত্র ও আর ওর বাবা-মাই আমাকে প্রথম থেকে আমার মতো করেই গ্রহণ করেছিল। তাই আমার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভোগেও পড়েছিল প্রচুর। মনে আছে একবার পাড়ার ছেলেরা আমাদের বাড়ির ওপর চড়াও হয়ে বাবা-মাকে বলল আমি একটি হিজড়ে। সুতরাং ভদ্দরলোকের পাড়ায় আমাকে রাখা যাবে না। অবিলম্বে আমাকে হিজড়েটোলায় জমা দিয়ে আসতে হবে। সেই সঙ্গে দেবশ্রীরা যে বাড়িতে ভাড়া থাকত সেই বাড়ির বাড়িওলাকে বলা হল ইমিডিয়েট ওদের বাড়িছাড়া করতে হবে। দোষ? ওরা সবাই আমার সঙ্গে মেশে। আমাকে ভালোবাসে। এটাই যথেষ্ট দোষ। কিন্তু পারেনি। এত চেষ্টা করেও ওরা কেউ আমার বা দেবশ্রীদের কোনও ক্ষতিই করতে পারেনি। বরং মাঝে একটা সময়ে এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম হয় আমি সুইসাইড করব অথবা আমি হিজড়ে কমিউনিটিতে গিয়ে জয়েন করব। কারণ আমার কারণে আমার নিরপরাধ বাবা-মাকে সমাজের কাছে প্রতি মুহূর্তে যে লাঞ্ছনা-অপমান সইতে হচ্ছিল সেটা একটা সময় আমি আর মেনে নিতে পারছিলাম না। বেরিয়েই গেছিলাম বাড়ি থেকে। কিন্তু সেই কমিউনিটিতে গিয়ে আমি যে বিভীষিকাময় জীবনযাত্রা দেখলাম তাতে আমার পক্ষে ওখানে একটা সেকেন্ডও থাকা সম্ভব ছিল না। আবার আত্মহননের কথা ভাবতেও মনে হল, কেন? আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। আমি আমার মতো। এটাই আমার অপরাধ?

বাড়ি ছেড়ে চলে গেলাম একটা এনজিওতে। সেখানেই থেকে কাজ করতে শুরু করলাম। কিছুদিন পর সেটাও কপালে থাকল না। কারণ এনজিওর কর্মকর্তারা চাইতেন আমি নিজেকে হিজড়ে বলে পরিচয় দিই। আমি তা দিতে নারাজ ছিলাম। কারণ, আমি বিশ্বাস করতাম আমি একজন মেয়ে। এনজিও-টা ছাড়তে হল। টাকা রোজগারের জন্য তখন শুরু করলাম কলেজস্ট্রিটের কিছু প্রকাশনা সংস্থায় প্রুফ দেখার কাজ। এই কাজটা করতে করতেই চাকরি পেলাম মিঠুন

চক্রবর্তীর 'খবরের কাগজ' নামে সংবাদপত্রে। কলাম লেখা, প্রুফ দেখার কাজ করতে থাকলাম। এত লড়াইয়ের মধ্যেই মনে মনে একটা স্বপ্ন ছিল আমার জীবনটাকে নিয়ে কেউ যদি ছবি করে। কিন্তু কে-ই বা করবে? মনে আছে একটা টক শোতে আমি প্রয়াত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি সমপ্রেমী মানুষদের নিয়ে ছবি করেন। কিন্তু হিজড়েদের নিয়ে ছবি করার কথা কখনও ভাবেন না। এটা কি কোনও ব্যক্তিগত কারণে? তিনি আমার প্রশ্ন শুনে ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে বললেন, আমি কোনও আজেবাজে প্রশ্নের উত্তর দেব না। আচ্ছা আমি কি কোনও অনৈতিক প্রশ্ন করেছিলাম? মনে তো হয় না। কিন্তু আমাকে থামিয়ে দেওয়া হল সেই শো-তে। বলা হল হিজড়ে সমাজ নিয়ে ছবি করলে কলকাতার দর্শক তা নিতে পারবে না। আমি তার উত্তরে পালটা প্রশ্ন করেছিলাম তাহলে কি আমাকে এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে ঋতুপর্ণ ঘোষের মতো মাপের পরিচালক শুধুমাত্র কলকাতার দর্শকদের কথা ভেবে ছবি করেন? কিন্তু তার উত্তর আমি পাইনি। বরং বুঝে গেছিলাম যে অন্তত উনি আমার গল্প নিয়ে ছবি করবেন না।

তবু অপেক্ষা করছিলাম। আমার গল্প নিয়ে। একটি মেয়ে যে ছেলে হয়ে জন্মেছিল। কিন্তু তার অন্তর ছিল নারীত্বে পরিপূর্ণ। তার লড়াই, তার বেঁচে থাকা, তার অস্তিত্ব—হ্যাঁ আমারই জীবনের গল্প। করবে কেউ?

একদিন সত্যি সত্যিই যেন ঈশ্বর আমার দরজায় এসে কড়া নাড়ল। জানতে পারলাম পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত আমার গল্প নিয়ে ছবিটি করতে আগ্রহী। শর্ত একটাই আমাকে সেই ছবিতে অভিনয় করতে হবে। এ যেন আমার স্বপ্নাতীত। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর প্রযোজনায় সোহিনী দাশগুপ্তর পরিচালনায় ২০০০ সালে তৈরি হল আই কুড নট বি এ সন মম। ডারবান ফেস্টিভালে পুরস্কৃত হল সেই ছবি। মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটের এই ডকু-ফিচারটা আমার গোটা জীবনটাকেই যেন বদলে দিল। যে সমাজের কাছে, পাড়ার লোকগুলোর কাছে আমি একটা অন্যজগতের প্রাণী হিসেবে গণ্য হতাম তারাই আবার আমাকে সাদরে ডেকে নিল কাছে। মানুষ বলে ভাবতে শুরু করল আমায়। আবার দীর্ঘদিন পর নিজের বাড়িতে ফিরতে পারলাম আমি, নিজের আদরের বাবা-মা'র কাছে। আমার জীবনের একপ্রান্তের স্বপ্ন পূর্ণ হল। কিন্তু অন্য প্রান্তটি তখনও অধরা। আমি চেয়েছিলাম আমি যেন আমার মনের মতো শরীরেও একজন নারী হয়ে উঠি। কিন্তু কীভাবে?

ছোটবেলায় মাইকেল জ্যাকসনের ফটো দেখিয়ে আমাকে এক বন্ধু বলেছিল এই দেখ এর নাম মাইকেল জ্যাকসন। উনি ছেলে থেকে মেয়ে হয়েছেন। সেই শুনে আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল তার মানে এমন হওয়া যায়। যদিও পরে জেনেছি মাইকেল সম্পর্কে এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। উনি একটি বিজ্ঞাপনের কাজ করতে গিয়ে ভয়াবহভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। প্লাস্টিক সার্জারির সময় তিনি তার ডক্টরকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যদি তাঁকে তাঁর পিসির মতো দেখতে করে দেওয়া যায়। সেটা আদৌ সম্ভব হয়নি। তবে জ্যাকসন একজন পুরুষই ছিলেন আমৃত্যু। আর পিডোফেলিক বলে তাঁর নামে যে কুৎসা

ছড়ানো হয় সেটাও আমি বিশ্বাস করি না। তিনি আজও আমার কাছে একজন আদর্শ হিরো। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম। আমার জেদ আমাকে যেভাবেই হোক একজন সম্পূর্ণ নারী হয়ে উঠতেই হবে। এখান থেকে ওখান থেকে সব ডাক্তারদের ফোন নাম্বার জোগাড় করি, যোগাযোগ করি তাদের সঙ্গে। কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে আসি। কেউ সাহায্যের আশ্বাস দেন না। বলেন এই দেশটা আমেরিকা নয়। অতি গরিব একটি দেশ। এখানে এই সব ভাবনা আসলে সোনার পাথরবাটি। তুমি যেমন হয়ে জন্মেছ, তেমনই থাক। বরং প্রার্থনা করো আগামী জন্মে ঈশ্বর যেন তোমাকে পুরোটা মেয়ে করে পাঠান।

কিন্তু তিস্তা তো হেরে যাওয়ার জন্য জন্মায়নি। হারলে অনেক আগেই হেরে যেতে পারতাম। আমি থামলাম না। কলকাতার সবথেকে বড় সরকারি হাসপাতালে গেলাম আমার আর্জি নিয়ে। একসময় আমাকে নিয়ে মেডিকেল বোর্ডও বসল। কিন্তু আবার ডিসমিস হয়ে গেল। সরকারি হাসপাতালে ভ্যাজাইনোপ্লাস্টি অপারেশনের কোনও অপশনই নেই। আমি শেষে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্রর কাছেও শরণাপন্ন হয়েছিলাম আমার আর্জি নিয়ে। তিনি ফিরিয়ে দিলেন। আবার অসহায় আমি। দিশেহারা। ফলত আমার জায়গা হল দত্তনগর মেন্টাল হেলথ সেন্টারে। আমি একজন সাইকো পেশেন্ট। সেই হিসেবে ট্রিটমেন্ট শুরু হল আমার। ট্রিটমেন্ট না বলে বরং বলা ভালো এক ভয়ঙ্কর প্রহসন। ওখানে আমার যিনি ডক্টর ছিলেন তিনি প্রথম থেকেই আমাকে বলে আসতেন যে আমার এই মেয়ে হয়ে ওঠার ইচ্ছে আসলে একটা ফ্যাশন। গড়ের মাঠে ছেলে নিয়ে গড়াগড়ি খাওয়ার জন্য। আচ্ছা বলুন তো স্রেফ একটা পুংলিঙ্গ পাব বলে আজীবন ধরে এত যন্ত্রণা কেউ সহ্য করতে পারে? এটা কখনও সম্ভব? শুধুমাত্র সেক্সের জন্য একটা মেল পার্টনার জোগাড় করা কি খুব কঠিন এই শহরে? তার জন্য সেই ছোট্টবেলা থেকে এত যন্ত্রণা কেউ কি সহ্য করে? আমাকে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো ওখানকার ডক্টররাও বুঝলেন না। এবং না বোঝার ফল হল মারাত্মক। সম্পূর্ণ অমানবিকভাবে আমাকে পর পর ছটা ECT (Electro convulsive Therapyu) দেওয়া হল! সে যে কী অসহনীয় যন্ত্রণা মুখে বলে বোঝানো যাবে না। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় আমাদের দেশে এটা আজও অব্যাহত। এই ইসিটি একমাত্র বিশেষ মাত্রার সাইকোটিক পেশেন্টদের দেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে আমিও একজন সাইকোটিক পেশেন্ট। কিন্তু সেই যন্ত্রণা সহ্য করার পরেও, দিনের পর দিন সেই সব মহান ডক্টরদের কাছে ট্রিটমেন্টের বদলে মানবিকতার চূড়ান্ত লাঞ্ছনার পরেও আমি বলেছিলাম আমি তিস্তা। এবং আমি অন্তরে যেমন একজন নারী, আমার বহিরঙ্গেও আমি নারীই হয়ে উঠতে চাই।

একটা সময় হাল ছাড়লেন ডক্টররাও। ছাড়া পেলাম ওখান থেকে। আমি জানি না কে আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে? দিলেন একজন মানুষ। কবি জয় গোস্বামী। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন মানবীদির (সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) সঙ্গে। সেই মানবীদি নিজেও ছিলেন ট্রান্সজেন্ডার। শরীরে পুরুষ থেকে নারী হয়ে উঠেছিলেন। তিনিই আমাকে সঠিক ডক্টরের সন্ধান দিলেন। তারপর আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলাম। বেশ কয়েকটা কাউন্সেলিং এর পর যখন উনি বুঝলেন আমি শারীরিকভাবে নারী হয়ে ওঠার উপযুক্ত, তখন আমার অস্ত্রোপচার হল। এই অপারেশনের আগে আমাকে প্রায় তিন বছর ধরে ইস্ট্রোজেন পিল নিতে হত। এটা কিন্তু আদৌ বার্থ কন্ট্রোল পিল নয়। ভারতের হিজড়ে সমাজ অজ্ঞানতাবশত আকছাড় এই বার্থ কন্ট্রোল পিল নিয়ে অকাল মৃত্যু ডেকে আনে। যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের।

আমি ডক্টরকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম আমার পৃথিবীতে জন্মানোর যে দিন ছিল, সেদিনই যাতে আমার নতুন জন্মদিন হয়। আমার কথা রেখেছিলেন ডক্টর। আমার পুরোনো জন্মদিনের দিনেই নতুন জন্ম হল আমার। যে হাসপাতালে আমি ভর্তি ছিলাম আমার বেডের জানলা দিয়ে বাইরে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখা যেত। ভর্তির আগে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছকে ছুঁইয়ে বলে এসেছিলাম আমি যদি নারী হয়ে উঠতে পারি তাহলে তুমিই হবে আমার প্রথম প্রেমিক। অপারেশন সাকসেসফুল হওয়ার পর আমি হাসপাতাল ছেড়ে যেদিন বেড়িয়ে আসছি সেদিন সত্যি সত্যি সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিলাম আমি। কী যে এক অনাবিল মুক্তির দিন ছিল সেই দিনটা।

সালটা ২০০২। মোট তিন লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা খরচ হয়েছিল অপারেশনে। অত টাকা তো আমার ছিল না। আমার পুরোনো স্কুলের এক টিচার, বন্ধুবান্ধব আর বাড়ির জমানো সামান্য পুঁজি দিয়েই সেই অপারেশনের খরচ জোগানো হয়েছিল। আজ আমি একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী। কোনও পুরুষের জন্য আমার এই নারী হয়ে ওঠা নয়, আমার একার জন্য, নিজের অস্তিত্বের জন্য। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় থেকে আমাকে কাউন্সেলিং এর জন্য বছরের পর বছর যেতে হয়েছে। ভালোবাসা, আঘাত দুই-ই পেয়েছি। আজ আমি নিজে একটি সংস্থার কাউন্সেলর। যেটুকু হতে পেরেছি তা সম্পূর্ণভাবে আমার আত্মবিশ্বাস আর প্রিয়জনদের ভালোবাসার কারণে। সবশেষে বলি ছেলে থেকে মেয়ে কিংবা মেয়ে থেকে ছেলে হয়ে যাওয়ার পদ্ধতিটি কিন্তু শুধুমাত্র কয়েকঘণ্টার অপারেশনের টেবিলে নেই। দীর্ঘদিনের এক আত্মদহনের, লাঞ্ছনা সহ্য করে দীর্ঘ লড়াইয়ের পথ। এটা কোনও আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নয় যে চাইলাম আর ছেলে থেকে মেয়ে কিংবা হয়ে মেয়ে থেকে ছেলে হয়ে গেলাম। ফ্যাশন হিসেবে ভাবলে তার ফল মারাত্মক। প্লিজ আমাকে আমার পূর্বাশ্রমের নাম কেউ জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ আমি বলব ভুলে গেছি। আমার কিচ্ছু মনে নেই। আমি কী ছিলাম তার থেকেও অনেক দামি আমি কী হয়েছি। আমি আমার মতো হয়েছি। কিন্তু কিছু মানুষের তো প্রশ্নের শেষ নেই? তাই অনেক সো কল্ড শিক্ষিত মানুষ যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে তিস্তা তুমি নারী তো হলে, কিন্তু মা হতে পারবে কি? তাদের প্রশ্ন শুনে আমার করুণা হয় তাদের প্রতি। ওরা জানে না আমি জন্ম দিতে না পারলেও অনেকের থেকে অনেক বেশি মা। ❖

পরে জেনেছি মাইকেল সম্পর্কে এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। উনি একটি বিজ্ঞাপনের কাজ করতে গিয়ে ভয়াবহভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। প্লাস্টিক সার্জারির সময় তিনি তার ডক্টরকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যদি তাঁকে তাঁর পিসির মতো দেখতে করে দেওয়া যায়।

সুন্দরের রূপান্তর

সিরাপসোন আথাঙ্কা

থাইল্যান্ডের নাগরিক সিরাপসোন আথাঙ্কা যে পুরুষ হয়ে জন্মেছিলেন আজ আর একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। ট্রান্সজেন্ডার সুন্দরীদের প্রতিযোগিতায় 'মিস ইন্টারন্যাশনাল কুইন'-এ ২০১১ সালে বিজয়ী হয়েছিলেন আথাঙ্কা। বর্তমানে তিনি একজন টপ মডেলও। ১৮ টি দেশের ২২ জন সুন্দরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হিসেবে বিবেচিত আথাঙ্কার মতে, যখন তাঁর ৬ বছর বয়স তখন থেকেই তাঁর নিজেকে নারী বলে মনে হয়। বর্তমান ফ্যাশন দুনিয়ায় তিনি একজন অতি পরিচিত নাম।

আন্দ্রে পেজিক একজন সার্বিয়ান-অস্ট্রেলিয়ান মডেল। নারী ও পুরুষ—উভয়ভাবেই ইতিমধ্যে একজন সফল বিখ্যাত মডেল তিনি। দু'ধরনের পোশাকেই ফটোগ্রাফারদের চমকে দেওয়ার মতো লুকস্ দেন পেজিক। গোটা বিশ্বের 'টপ মডেল'-এর তালিকায় পুরুষ মডেল হিসেবে তাঁর র‍্যাঙ্ক ৫০। অন্যদিকে গত ২০১১ সালের 'সেক্সিয়েস্ট উইমেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর প্রথম ১০০ জন সুন্দরীর তালিকাতেও তিনি হাজির! আন্দ্রে পেজিক বর্তমান বিনোদন দুনিয়ার এক আলোচিত ও পরিচিত নাম।

আন্দ্রে পেজিক

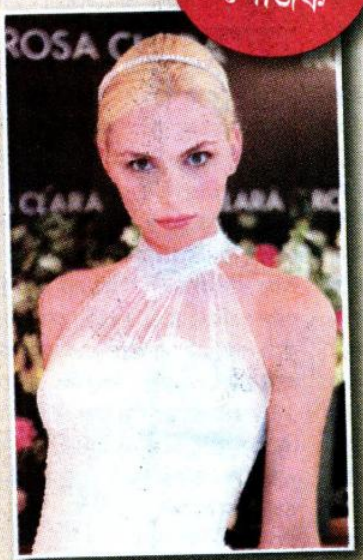

লি টি

লি'র জন্ম ১৯৮১ সালে। জন্মের সময়ে পুরুষ হিসেবেই তাঁর লিঙ্গ নির্ধারণ হলেও ২০১১ সালে লি টি'র অস্ত্রোপচার (Sex Reassigenment Surgery) হয়। লি'র মতে, বছর ২০ বয়স অবধি নারী এবং পুরুষ উভয়লিঙ্গের প্রতিই আকর্ষণ বোধ করলেও বর্তমানে তিনি একজন সম্পূর্ণত নারী। শুধু নারী নয়, লি টি আন্তর্জাতিক বিনোদন দুনিয়ার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। ২০১১ সালের 'সাও পাওলো ফ্যাশন উইক' র‍্যাম্পে একজন নিউ কামার মডেল হিসেবে হাঁটার পর তাঁকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

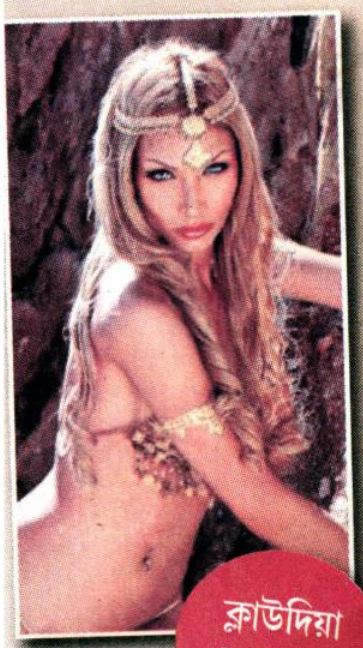

ক্লাউদিয়া ক্যারেজ

ক্লাউদিয়ার জন্ম আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটিতে। ১৯৮২ সালে। পুরুষ হিসেবে জন্ম নিলেও সফল অস্ত্রোপচারের পর তিনি এখন আকর্ষণীয়া নারী। ১৬ বছর বয়স থেকেই মডেলিং পেশার সঙ্গে যুক্ত ক্লাউদিয়া ২০০৬ সালে 'আমেরিকাস নেক্সট টপ মডেল' প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনাল অবধি পৌঁছে যান। কিন্তু ট্রান্সসেক্সুয়াল হওয়ায় বাতিল হয়ে যান ওই কনটেস্ট থেকে। এই নিয়ে বিরাট শোরগোল হয় সে সময়। এরপরেও ক্লাউদিয়া আজ তাঁর পেশার জগতে নিজেকে প্রমাণ করেছেন সফল ভাবে।

খুব কম লোকই জানে যে, ক্যামেলি আসাঙ্কার মতো একজন অপূর্ব সুন্দরী জন্মেছিলেন কিন্তু পুরুষাঙ্গ নিয়ে। প্রথমে নিজের দেশ শ্রীলঙ্কার ফ্যাশন জগতে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন তিনি। পেয়েছেন আন্তর্জাতিক সাফল্যও। আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির ভীষণ চেনা মুখ ক্যার্মেলি আসাঙ্কা বর্তমানে একজন ব্যস্ততম মডেল। ট্রান্সজেন্ডার সুন্দরী প্রতিযোগিতা 'মিস ইন্টারন্যাশনাল কুইন ২০১১'-তে শ্রীলঙ্কার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন আসাঙ্কা।

ক্যামেলি আসাঙ্কা

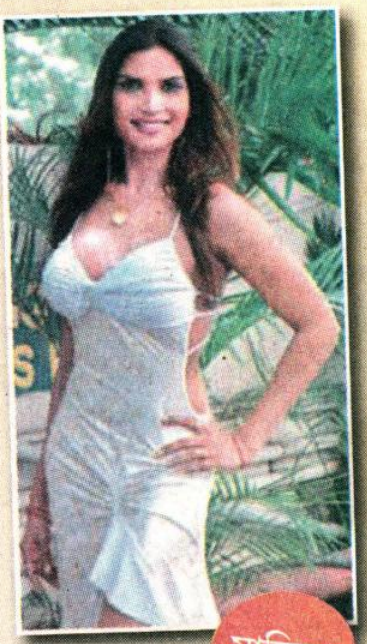

মালিকা

মালিকা প্রথম ট্রান্সজেন্ডার ভারতীয় মহিলা, যিনি ট্রান্সজেন্ডার বিউটি কনটেস্ট 'মিস ইন্টারন্যাশনাল কুইন'-এ দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। অন্যরা তাঁকে পুরুষ ভাবলেও মালিকা নিজেকে নারী বলেই জানতেন। বেশ কয়েকটি সফল অস্ত্রোপচারের পর শারীরিকভাবে একজন সম্পূর্ণ নারীতে রূপান্তরিত হন তিনি। মালিকার অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারও সম্ভ্রম করার মতো। তিনি হোটেল ম্যানেজমেন্টে ডিগ্রি করেছেন। পেশাদার মডেল না হলেও অল্পবিস্তর মডেলিংও করেছেন মালিকা।

ফেমডম

বিনোদ ঘোষাল

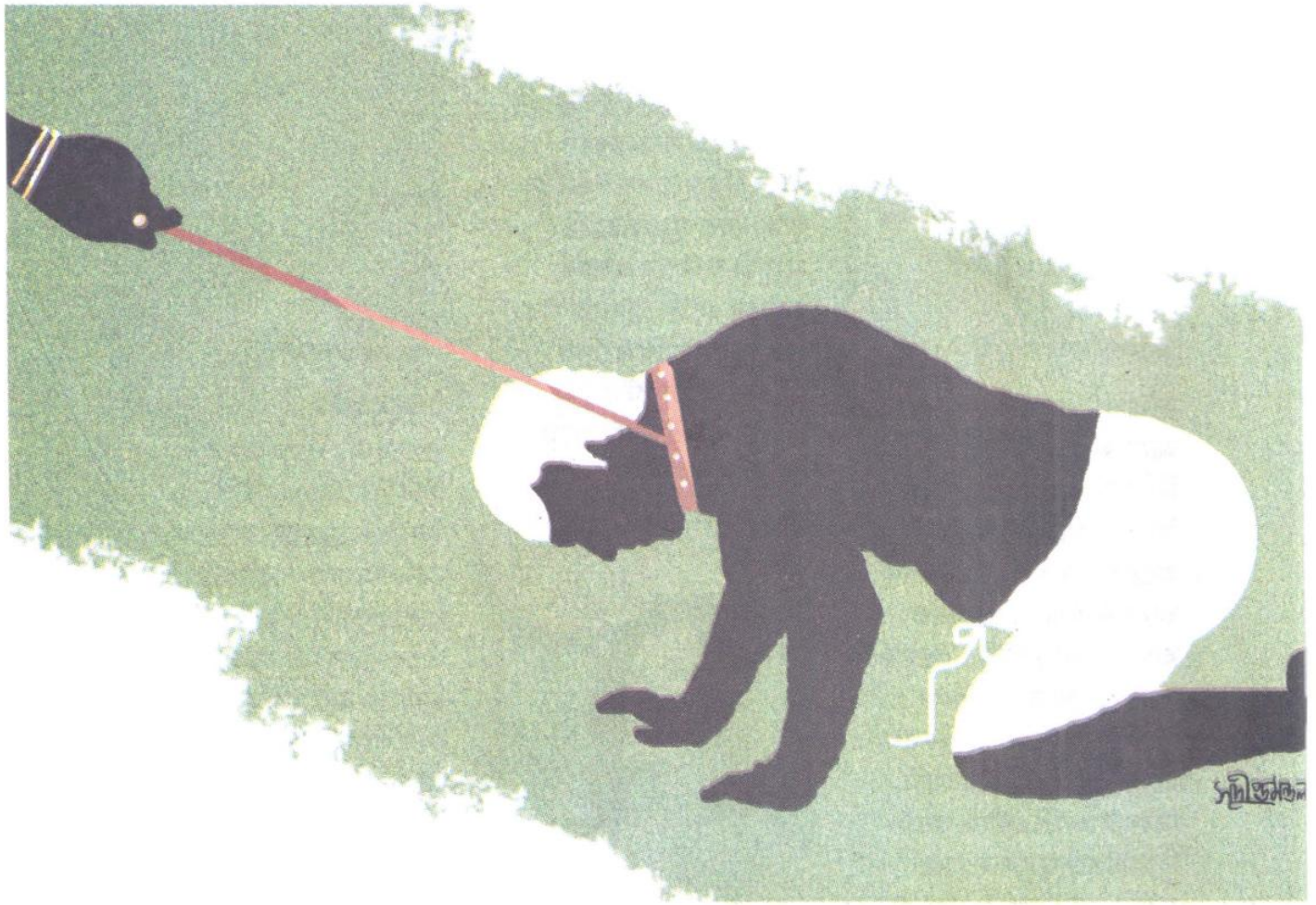

নৃসিংহ কোনওকালেই এই ধরনের হেনস্থা সহ্য করতে পারেন না। না, মহিলাদের তিনি অত্যন্ত সম্মান করেন সে কারণে নয়, তার মতে মহিলাদের যৌন হেনস্থা করা মানে তাদেরকে একটু বেশিই পাত্তা দিয়ে ফেলা।

আজ শুক্রবার। গোটা সপ্তাহে শুধুমাত্র শুক্রবার রাত্রিটা একটু অন্যরকম কাটে মিঃ এন পি ভট্টাচারিয়ার। আজ থেকে নয়, দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে। যখন প্রবাসে ছিলেন তখনও। মিঃ এন পি ভট্টাচারিয়া বাংলায় হলেন নৃসিংহ প্রসাদ ভট্টাচার্য। আজ থেকে তেষট্টি বছর আগে ঠাকুর্দা এই নাম রেখেছিলেন। তিনি নেই, কিন্তু নৃসিংহ নামটা রয়ে গেছে। ছোটবেলায় স্কুলে এমন নামের জন্য মাঝেমধ্যেই বন্ধুরা নৃসিংহকে ব্যঙ্গ করত। তাই ক্লাস সিক্সে নৃসিংহ ঠিক করেছিলেন নিজের ঠাকুর্দাদত্ত নামটি এফিডেভিট করে চেঞ্জ করে নেবেন। বাবার কাছে সেই প্রস্তাব রাখায় বাবা বেজায় হতবাক হয়ে বলেছিলেন, সে কী! যে নামের মধ্যে এতটা পৌরুষ রয়েছে তাকে তুমি বদলে ফেলতে চাও? এমন শৌর্যে বীর্যে ভরা নাম তুমি আমাকে আরেকটা বলো দেখি। যদি বলতে পারো তাহলে আমি রাজি।

বাবার এমন কথা শুনে সেই প্রথমবার খুব চিন্তায় পড়ে গেছিলেন নৃসিংহ। এইভাবে তো ভেবে দেখা হয়নি কখনও। নৃসিংহদেবের ছবিটা ভাবলেই চোখের সামনে একটা ভয়ঙ্কর দর্শন অবয়ব ভেসে ওঠে। পৌরুষে টইটম্বুর এক ভীষণ মূর্তি। অমিত বলশালী। হিরণ্যকশিপুর মতো প্রবল পরাক্রমী অসুরকেও যে অনায়াসে নিজের নখরে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের দশম অবতারের মধ্যে অন্যতম। নাহ্, অনেক ভেবেচিন্তেও এই নামের ধারেকাছে আর কোনও পুরুষালী নাম ভেবে উঠতে পারেননি তিনি। রেখেই দিলেন নৃসিংহ নামটা। উপরন্তু যেটা হল সেই বয়স থেকেই সচেতনভাবে অতিমাত্রায় পুরুষোচিত হয়ে উঠলেন। সেই ব্যক্তিত্ব ক্লাস সিক্সে অতটা না মানালেও একটা বয়সের পর দিব্বি মানিয়ে গেল। নৃসিংহপ্রসাদ নামটি বেশ বড়। তাই স্কুল কলেজের শিক্ষক, বন্ধুরা তাকে সংক্ষেপে এন পি বলে ডাকত। সেটাই চল হয়ে গেল একসময়। কিন্তু নিজের মনে মনে তিনি বরাবরই নৃসিংহ রয়ে গেলেন।

মেধা ছিল উন্নত। ক্লাসের কোনও পরীক্ষায় ফার্স্ট অথবা সেকেন্ড ছাড়া আর হননি। সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি, গ্র্যাজুয়েশনেও উজ্জ্বল রেজাল্ট নিয়ে এমবিএ পড়ে চাকরি নিয়ে সটান চলে গেলেন স্টেটসে। সেখানেই দীর্ঘ পঁচিশ বছর। অতিরিক্ত পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের কারণে এন পির জীবনে কোনও প্রেম ঘটেনি। প্রিম্যারিটাল, এক্সট্রা ম্যারিটাল এইসব শব্দগুলো এন পির কাছে অত্যন্ত হাস্যকর এবং বিরক্তিদায়ক একটি শব্দবিশেষ। তবে বাবার কারণে এন পির ম্যারিটাল স্টেটাস অবশ্যই ম্যারেড। খাঁটি দেশজ, সদ্‌বংশজাত একটি সুপাত্রী শ্রীলার সঙ্গে নৃসিংহের বিয়ে হয়েছিল। তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবনে কখনওই শ্রীলার সঙ্গে নৃসিংহের মনোমালিন্য বা দাম্পত্য কলহ হয়নি। কারণ কলহের জন্য যে পরিমাণ দাম্পত্য বা ভালোবাসার সম্পর্ক যাই হোক না কেন তা গড়ে ওঠেনি দু'জনের মধ্যে। অবশ্য তার জন্য নৃসিংহই দায়ী। সে কথা অকপটে স্বীকার করেন তিনি নিজেই। মহিলা জাতি সর্বদাই পুরুষ সিংহের নীচে থাকবে। তাকে মাথায় তোলা যাবে না। তুললে পুরুষের অপমান। কিন্তু তা বলে কোনও মহিলাকে ন্যূনতম অপমানও করার প্রবল বিরুদ্ধে তিনি। একজন মানুষকে ঠিক যতটা সম্মান দেওয়ার ঠিক ততটাই সম্মান উনি দিয়ে এসেছেন এই তেষট্টি বছর বয়সেও। এই বয়েসেও নৃসিংহর টানটান নির্মেদ চেহারা। সাদা চুল ব্যাকব্রাশ করা। ভরাট গলা এবং পাঁচফুট দশ ইঞ্চি হাইট।

নৃসিংহ এবং শ্রীলার একটি সন্তান। নাম ত্রিদিব। তার বয়স বর্তমানে একত্রিশ। নিউইয়র্কে একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করে। মেম বিয়ে করে ওখানেই সেটলড। পিতা-পুত্রর খুব যে সদ্ভাব তা নয়। তবে সম্পর্ক ছিন্নও নয়। কয়েক বছর পরপর কিছুদিনের জন্য আসে। মাস খানেক কাটিয়ে যায়। বাকি ফোনে যোগাযোগ। আটান্ন বছর বয়সে নৃসিংহ বিদেশ ছেড়ে নিজের দেশে এসে কলকাতায় একটি মস্ত কোম্পানির সিইও। এন পি-র কর্মদক্ষতা এবং ব্যক্তিত্বের কাছে আজও টপ মোস্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে একেবারে অফিস পিওন প্রত্যেকে মনে মনে কুর্নিশ জানায়। নৃসিংহ নিজেও হয়তো জানান। কিন্তু সারা সপ্তাহের নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য আর শুক্রবার রাত্রের নৃসিংহ প্রসাদের মধ্যে...।

> বাবার কাছে সেই প্রস্তাব রাখায় বাবা বেজায় হতবাক হয়ে বলেছিলেন, সে কী! যে নামের মধ্যে এতটা পৌরুষ রয়েছে তাকে তুমি বদলে ফেলতে চাও? এমন শৌর্যে বীর্যে ভরা নাম তুমি আমাকে আরেকটা বলো দেখি।

গতকাল দুপুরের পর থেকেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছিল নৃসিংহর। তারই অফিসের এক পুরুষ কর্মচারী এক মহিলা সহকর্মীকে যৌন হেনস্থা করেছে বলে অভিযোগ এসেছিল। মেল-এ অভিযোগ করেছিলেন সেই মহিলা নিজেই। নৃসিংহ কোনওকালেই এই ধরনের হেনস্থা সহ্য করতে পারেন না। না, মহিলাদের তিনি অত্যন্ত সম্মান করেন সে কারণে নয়, তার মতে মহিলাদের যৌন হেনস্থা করা মানে তাদেরকে একটু বেশিই পাত্তা দিয়ে ফেলা। অর্থাৎ কি না পুরুষের অপমান। যেসব পুরুষেরা মহিলাদের সঙ্গে এই ধরনের আচরণ করেন তাদের কৃমিকীটের মতো মনে হয়

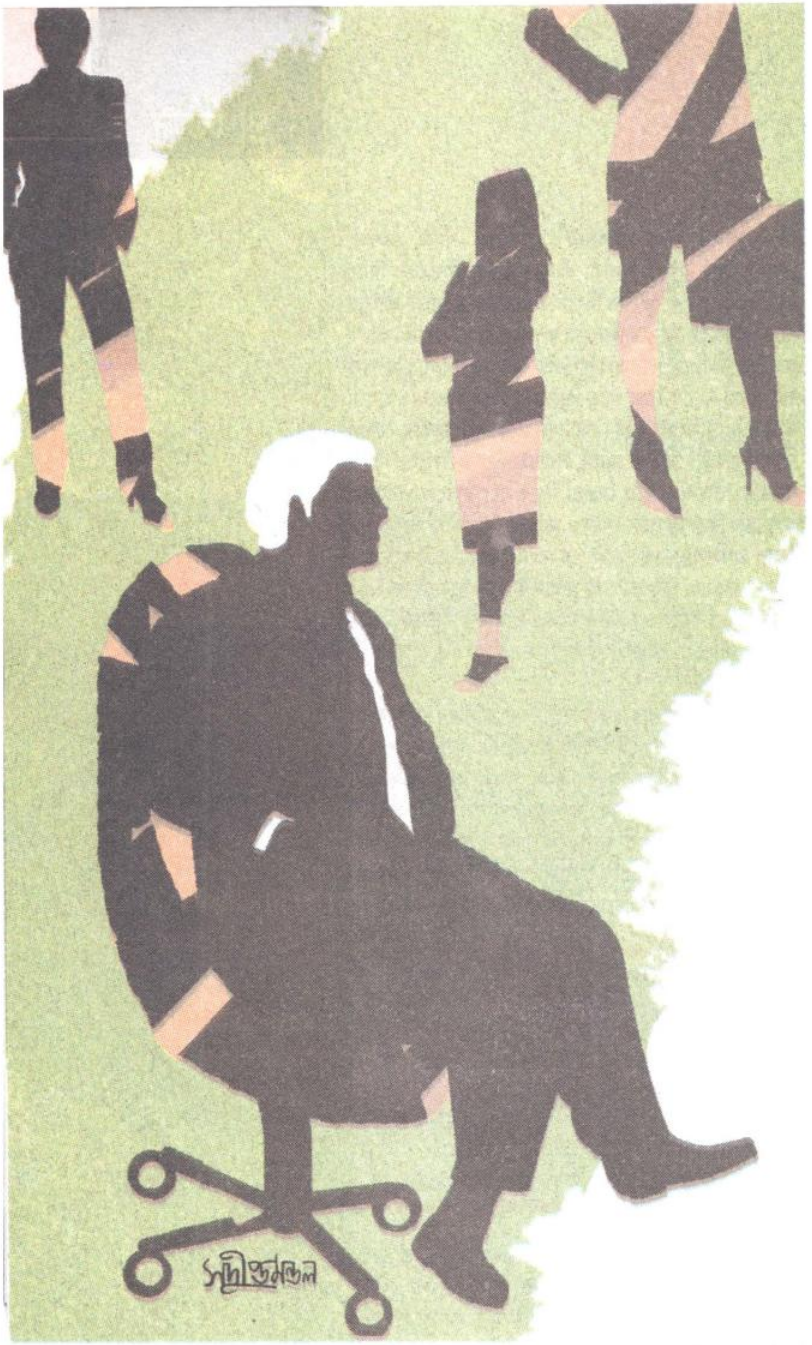

মিঃ এন পি ভট্টাচার্য সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছেন। তার গলায় বাঁধা বকলস দেওয়া চেইন। সেই চেইনের অপরপ্রান্ত ধরে রয়েছে রেশমা। তার উর্ধাঙ্গ উন্মুক্ত। পরনে শুধুমাত্র স্বচ্ছ প্যান্টি।

নৃসিংহর। রীতিমত বোর্ড মিটিংডেকে আজ একটু আগে ছেলেটিকে স্যাক করলেন তিনি। কোনও প্রকার অনুনয় বিনয় তিনি কানেই তুললেন না। ছেলেটাকে ছাড়ানোর পর মাথার ভেতরটা একটু হালকা হল। এখন রাত্রি সাড়ে সাতটা। এবার বেরোনো উচিত। নিজের চেম্বার লাগোয়া টয়লেটে ঢুকলেন নৃসিংহ। ফ্রেশ হয়ে আয়নার সামনে খুব খুঁটিয়ে একবার দেখলেন নিজেকে। আয়নার কাছে নিজের মুখ নিয়ে এগিয়ে এলেন। আরও ভালো করে দেখলেন নিজের মুখ আজ শেষবারের মতো।

।।২।।

রাত সাড়ে নটা। বালিগঞ্জের একটি আকাশচুম্বী ফ্ল্যাটবাড়ির তেরো তলা। চার হাজার স্কোয়ার ফিটের একটি ফ্ল্যাটের মধ্যে মিঃ এন পি ভট্টাচার্য সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছেন। তার গলায় বাঁধা বকলস দেওয়া চেইন। সেই চেইনের অপরপ্রান্ত ধরে রয়েছে পঁচিশ বছর বয়সি তন্বী রেশমা। তার উর্ধাঙ্গ উন্মুক্ত। পরনে শুধুমাত্র স্বচ্ছ প্যান্টি। রেশমার অন্যহাতে একটি লেদার হুইপ। যা দিয়ে মাঝেমধ্যেই সে এন পির পশ্চাদ্দেশে, পিঠে আঘাত করছে আর সেই আঘাতের শব্দে তিনি অবিকল পোষা কুকুরের মতো মুখ তুলে আউউউ করে শব্দ তুলছেন। ঠিক সেই সময় রেশমা বলে উঠছে, টমি কাম অন। টমি হ্যাভ ইয়োর মিল। আই সে হ্যাভ ইয়োর মিল। ডোন্ট বি নটি। কাম অন। এন পির সামনে একটা বাটিতে রাখা খানিকটা স্কচ। সেই স্কচ কুকুরের মতোই চেটে চেটে খাচ্ছে এন পি। আর মাঝেমধ্যে রেশমার মাখন ত্বকের খোলা পা-দুটো চেটে দিচ্ছেন। গলায় বাঁধা চেন টেনে এ ঘর থেকে ও ঘর ঘোরাচ্ছে রেশমা। এন পি কুকুরের মতোই কখনও যেতে অবাধ্য হলে আবার চাবুক পড়ছে পিঠে, কখনও লাথি। যন্ত্রণায় নয়, আনন্দে বার বার মুখ তুলে আউউউ করে শব্দ করছেন তিনি। একটু আগে বোতল থেকে জল খেয়ে খানিকটা জল কুলকুচো করে এন পির গায়ে ছিটিয়ে দিল রেশমা। এন পি কাউ কাউ করে শব্দ করলেন। আবার চেটে দিলেন রেশমার পা। এবার গায়ে থুতু দিল রেশমা।

এই দৃশ্যটা আরও কিছুক্ষণ চলবে। ঠিক এমনটাই চলবে মোট ঘণ্টা দেড়েক। তার বেশি না। তারপর একসময় এন পি আবার স্যুট বুট পরে রেশমাকে নগদ কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে বেরিয়ে আসবেন সেই ফ্ল্যাট থেকে। নৃসিংহ ভট্টাচার্য হয়ে বাড়ি ফিরবেন। স্টেটসে থাকাকালীন এন পির এই অভ্যাস ছিল দিনরাত্রের। এখানে তা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র সপ্তাহে একটি দিন। শ্রীলা কোনওদিনই কিছু জানতে পারেনি। সে ভাবতেই পারে না তার এত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বামী আসলে একজন ফেমডম। নারীর দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে যৌন আনন্দ পায়। পতিভক্তিপরায়ণা শ্রীলার পক্ষে তাঁর স্বামীর সঙ্গে এহেন আচরণ স্বপ্নাতীত। পুরুষ মানুষের অনেক কিছুই তো জানেন না শ্রীলা। যেমন ক্রসড্রেসার মানে সেইসব পুরুষ যারা মহিলাদের পোশাক পরে প্লেজার পায় কিংবা কাকোল্ড মানে যে সব পুরুষেরা তার স্ত্রী কিংবা সঙ্গিনীকে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমরত দেখে তৃপ্তি পায়। না জানুক, ক্ষতি কি? কত কিছুই তো পরস্পরের না জেনে দিব্বি গোটা জীবন কাটিয়ে দেয় পাশাপাশি দুটো মানুষ। ❖

অলঙ্করণ: সুদীপ্ত মণ্ডল

লিঙ্গ রূপান্তর

জেন্ডার রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি

ডা. পি যশ

এম এস-প্লাস্টিক সার্জ (পিজিআই), এফ আর সি এস(এড)
কনসালট্যান্ট প্লাস্টিক অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জন

প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি (বা জেন্ডার রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি) বিষয়টা নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রচুর ভুল ধারণা রয়ে গেছে আজও। এমনকী বেশ কিছু চিকিৎসকেরও বিষয়টি নিয়ে ধারণা পুরোপুরি স্বচ্ছ নয়।

শারীরিক লিঙ্গের বিভাজন অনুযায়ী সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি দুটি ভাগে বিভক্ত। মেল টু ফিমেল সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট এবং ফিমেল টু মেল সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট।

মূলত দুটি প্রধান স্তরে সম্পন্ন করা হয় সার্জারিটি। প্রথমটি হল ব্রেস্ট আগমেন্টেশন অব ম্যামাপ্লাস্টি, আর অন্যটি হল ভ্যাজিনোপ্লাস্টি। যাদের ক্ষেত্রে অপারেশনের আগে করা হরমোন থেরাপির পরেও স্তনের গঠন আশানুরূপ হয় না (আকৃতিতে ছোট হয়) তাদের ক্ষেত্রে প্রথম সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন হিসেবে করাতে হয় ব্রেস্ট এনহ্যান্সমেন্ট সার্জারি। সিলিকন জেল ইমপ্ল্যান্ট, অথবা স্যালাইন ইমপ্ল্যান্টের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয় এই কাজটি। তারপর শরীরের অবস্থা অনুযায়ী ছয় থেকে আট মাসের ব্যবধানে করা হয়ে থাকে ভ্যাজিনোপ্লাস্টি। অধিকাংশ মানুষই আজও মনে করে থাকেন মেল টু ফিমেল সেক্স চেঞ্জ সার্জারি মানে শুধু বাইরে থাকা মেল অর্গ্যানটি কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সেটা মোটেই সঠিক ধারণা নয়। বরং যদি কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার মেল জেনিটালিয়া (ফুল পেনেক্টমি ও ফুল অর্চিডেক্টমি) সম্পূর্ণভাবে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তবে তার ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে এই সার্জারিটি খুবই জটিল হয়ে ওঠে যা কিন্তু তার স্ত্রী-যৌনাঙ্গ নির্মাণের পক্ষে বড় রকমের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

এই সার্জারির মাধ্যমে ব্যক্তির 'পেনিস' এবং 'স্ক্রোটাল টিস্যু'-কে কাজে লাগিয়েই তার 'সেক্সুয়ালি ফাংশনাল ভ্যাজিনা'-টি নির্মিত হয়। যদিও সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এখন আরও উন্নত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে ভ্যাজিনোপ্লাস্টির ক্ষেত্রে।

পদ্ধতিগতভাবে বেশ পরিশ্রমের এই সার্জারিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করা হয় লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া (স্পাইনাল অ্যানাস্থেশিয়া)-র মাধ্যমে। কোনও কোনও সময়ে জেনারেল অ্যানাস্থেশিয়ার মাধ্যমেও এটি করা হয়ে থাকে। মোটামুটি ঘণ্টা সাতেকের এই অপারেশনটিতে পেনিসের ওপরের চামড়াটিকে দু'পাশ থেকে কেটে একটি ভল্ট তৈরি করা হয়। সেটিকে উল্টে (যেটা দেখতে লাগে অনেকটা কোলবালিশের ফাঁপা খোলের মতো) তৈরি করা হয় যোনির দেওয়াল। এই কারণেই এই পদ্ধতিটির নাম দেওয়া হয়েছে 'পেনাইল ইনভার্শন টেকনিক', যার মধ্যে সমস্ত রক্তবাহী শিরা ওবং স্নায়ুগুলি অক্ষত অবস্থায় থাকায় পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে যৌন সঙ্গমকালে সম্পূর্ণ যৌন অনুভূতি পেতে পারেন রূপান্তরিত নারীটি। গ্লান্স পেনিসের একটি অংশ থেকে তৈরি করা হয় যৌন সংবেদনশীল ক্লিটোরিস, যা থেকে পাওয়া যায় অপরিমেয় যৌন তৃপ্তি। ওই সময়ে মূত্রনালীটিকে (উরেথ্রা) মহিলাদের মতো করে পরিস্থাপন করা হয় ক্লিটোরিস আর ভ্যাজিনার মাঝখানে।

বাই ল্যাটারাল অর্কিডেক্টমির মাধ্যমে দু'দিকের শুক্রাশয়ের ভিতর থেকেই বার করে ফেলে দেওয়া হয় অণ্ডকোষগুলি। তারপর শুক্রাশয়ের চামড়াকেই কাজে লাগিয়ে নিপুণভাবে তৈরি করা হয় স্ত্রী-যৌনাঙ্গের আরও দুটি অংশ—'লেবিয়া মেজরা' ও 'লেবিয়া মোনোরা'। প্রথম দিকে এই সার্জারির ভ্যাজিনোপ্লাস্টির প্রায় মাস ছয়েক পরে তৈরি করা হত 'লেবিয়া মাইনোরা'-টি। কিন্তু এখন একটি মাত্র সিটিং-এ করে দেওয়া যাচ্ছে ওই দুটি অংশই। পেনাইল ইনভার্শন পদ্ধতিতে নির্মিত ভ্যাজিনার গভীরতা নির্ভর করে তার পেনিসের দৈর্ঘ্যের ওপরে। অর্থাৎ যত দীর্ঘ পেনিস, তত বেশি তার ভ্যাজিনার গভীরতা। শল্য চিকিৎসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এখন অবশ্য পেনিসের দৈর্ঘ্য ছোট হওয়াটাও আর তেমন সমস্যার ব্যাপার নয়। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে শুক্রাশয়ের বাড়তি চামড়াকে (স্ক্রোটাল স্কিন) কাজে লাগিয়ে বা সেগমেন্ট কোলনের সাহায্যে এই সমস্যারও সমাধান করে ফেলেছে চিকিৎসা বিজ্ঞান। তবে শুধু অপারেশন করাটাই শেষ কথা নয়। পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারটিও খুব জরুরি। সেটার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল সুস্থ যৌন জীবন।

মেল টু ফিমেল জেন্ডার রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির থেকে ফিমেল টু মেল সার্জারিটি তুলনামূলকভাবে অনেক জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। কারণ এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শরীরের অভ্যন্তরীন স্ত্রী-যৌনাঙ্গগুলি বাদ দেওয়ার ব্যাপারটিও (এই সার্জারিটি কমপ্লিট হিস্টেরেক্টমি এবং সেল্ফিঙ্গো-ওফোরেক্টমি নামে পরিচিত)। যে কাজটি করে থাকবেন একজন 'গাইনোকলজিস্ট'। এরপর থাকে পুরুষ হতে চাওয়া মানুষটির 'মেল টাইপ চেস্ট রিকনস্ট্রাকশন'-এর প্রক্রিয়াটি। 'বাই ল্যাটারাল ম্যাসটেক্টমি'-র মাধ্যমে এই কাজটি করা হয়ে থাকে। এর পর বাকি থাকে সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশটি, যার মাধ্যমে তৈরি করা হয় পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পেনিস (বিজ্ঞানসম্মত নাম ফ্যালোপ্লাস্টি) বা স্বল্প দৈর্ঘ্যের পেনিস (বিজ্ঞানসম্মত নাম মেটাওইডিওপ্লাস্টি)। ওই একই সময়ে দু'পাশের লেবিয়া মেজোরা-র ভিতর সিলিকন দিয়ে তৈরি টেস্টিকুলার ইমপ্ল্যান্টের সাহায্যে তৈরি করা হয় দৃশ্যত স্বাভাবিক দুটি অণ্ডকোষ। যদিও পেনিস তৈরির প্রথম পদ্ধতির চাইতে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সাফল্যের বিচারে অনেক বেশি ফলপ্রসূ।

কারণ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে 'অ্যানাটমিক্যালি কারেক্ট' একটি পেনিস তৈরি করা হয় যেটি দৈর্ঘ্যে ছোট হলেও সম্পূর্ণ যৌন অনুভূতি এবং যৌন উত্তেজনার সময়ে প্রাকৃতিকভাবে দৃঢ় হবার ক্ষমতাসম্পন্ন যেটা 'ফ্যালোপ্লাসি'-র এক প্রকার প্রায় অসম্ভব। সেক্ষেত্রে যেমন নির্মিত পেনিসটির মধ্যে থাকে না কোনও যৌন অনুভূতি, তেমনই একটি কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া সেটিকে উত্থিত করানোটা একেবারেই অসম্ভব।

পুরুষ থেকে নারী হওয়া বা নারী থেকে হবার দুটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিদের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে কিছু শারীরিক সীমাবদ্ধতা। হয়ে ওঠা নারীটির ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষে যেহেতু ইউটেরাস এবং ওভারি নির্মাণ সম্ভব নয় তাই তার পক্ষে সন্তান-ধারণ করাটা সম্ভবপর নয়।

অন্য দিকে পুরুষটির ক্ষেত্রে যেহেতু সক্রিয় অণ্ডকোষ তৈরিটা এখনও অসম্ভব, তাই তাদের ক্ষেত্রে স্পার্ম উৎপাদন সম্ভব নয়।

তবে এই সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রূপান্তরিত ব্যক্তিদের সার্বিক যৌন জীবন ব্যাহত হয় না। ❖

গল্প

এলভিস ও অমলাসুন্দরী

শমীক ঘোষ

দু'জনেই বুড়ো হয়ে গিয়েছে। জরা গ্রাস করেছে দু'জনকেই। বাড়িটার পলেস্তারা খসে গেছে জায়গায় জায়গায়। অনেক আগেই ধুয়ে গিয়েছে রং। সামান্য যেটুকু আছে তাতেও ভাগ বসিয়েছে আগাছার শিকড়। দোতলার বারান্দা খসে গেছে। কার্নিশ তবু দাঁড়িয়ে আছে।

বহু প্রাচীন ইতিহাসের মতো। রোদ-বৃষ্টির দাগ শরীরে নিয়ে।

অমনই অমলাসুন্দরী। ঘন জ্যোৎস্নার মতো সামান্য লাল চুল এখন জ্যৈষ্ঠের ফ্যাটফ্যাটে আকাশের মতো ফিকে। পরিপাটি ত্বকে অনেক বসন্তের পর এখন শীতের বলিরেখা। রং পুড়েছে।

তবু দু'জনেই যেন আঁকড়ে আছে পরস্পরকে। ইটের মধ্যে নারীর পাঁজর। একদিন একসঙ্গে খসে যাবে বলেই বোধহয়।

বাড়িতে দু'টি মাত্র প্রাণী। তিনি আর ঝি সুভামা। আর আছে নুটু, বাড়ির একমাত্র পুরুষ, হুলো বেড়াল। তবে তার বাড়িতে থাকা শুধু খাবার সময়।

প্রতিদিন সকাল হলেই দালানে দাঁড়িয়ে তিনি নিজে তদারকি করেন।

ও মা! ওখানে ঝাঁট দিলি না যে?

দিলাম তো এই মাত্র। তুমি দেখবে না আমার দোষ!

ফের বাজে কথা? বুড়োধাড়ি মিথ্যে বলিস কী করে? ওই দেখ ধুলো কত!

ধুলোর আর দোষ কী? বাড়ি তো তোমার দিন দিন সেজে উঠছে।

তিনি চুপ করে যান। একসময় এই বাড়ি গমগম করত লোকে। ঝি চাকর ঠাটবাট। মেয়েরা দালানে আসত কদাচিৎ। ইংরেজ আমলে নাকি এই বাড়িতে প্রায়শই পায়ের ধুলো দিতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর শাশুড়ির কাছে শোনা। তারপর সবই গিয়েছে। গত হয়েছেন সৌরীন্দ্রমোহন। তাঁর আমলেই ঠাটবাট সব গিয়েছিল। ছেলেপুলে হয়নি। সৌরীন্দ্রমোহন শেষ বয়সে যেন আরও বেশি করেই ওড়াতেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'খাবে কে? খাবে তো পঞ্চভূত। তার চাইতে এখনই যাক না।'

তারপর থেকে তিনিই সামলাচ্ছেন সব কিছু। অপেক্ষা করে রয়েছেন কবে শেষ শীত নামে তাঁর একলা উঠোনে। তবু বাড়িটাকে ছাড়তে পারেন না তিনি। যেটুকু আছে, ঝকঝকে তকতকে করে রাখা তাঁর স্বভাব। সৌরীন্দ্রমোহনের টেবিল আজও সাজানো হয় সাদা সাটিনে। পেতলের ফুলদানিতে ফুল থাকে না অবশ্য।

চৈত্র মাসের সকালবেলা। দালান জুড়ে কুয়াশার মতো ঝাঁটার ধুলো। এমন সময় ওরা এল। সামনে ওপাড়ার রবি। পিছনে একটা মেয়ে।

'দিদা, এই ইনি আপনাদের বাড়ি খুঁজছিলেন' রবি মুগ্ধ চোখে তাকায় মেয়েটির দিকে। কিন্তু বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে মেয়েটি বলে, 'আর উ অমলা... আই মিন... মানে আমি কি অমলাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

মেয়েটার পিঠে ঢাউস একটা ব্যাগ, স্কুল ব্যাগের মতো, একটু বড়। ছেলেদের মতো গেঞ্জি পরা, জিনসের প্যান্ট। লালচে চুলগুলো আলগোছে খোঁপা করে রাখা। এক কান থেকে সাদা তার বেরিয়ে রয়েছে। অন্য তারটা আর এক হাতে।

অমলাসুন্দরী অবাক হলেন। এমন মেয়ে এখানে বড় একটা দেখা যায় না!

তাঁর উত্তর দেওয়ার আগেই বলে উঠল সুভামা, 'ওমা! তোমাকে খুঁজছে গো!'

'আপনিই অমলাসুন্দরী, মানে দিদা... আমি নীপা, আমার বাবার নাম টুকু... মানে... রমলাসুন্দরী আমার ঠাকুমা।'

মেয়েটা এগিয়ে এল। অমলাসুন্দরী ভাবলেন হয়তো প্রণাম করবে। করল না। প্রায় জড়িয়ে ধরল। মুখে মুখ ঘষে দিল। মুখটা বড় চেনা। রমলাসুন্দরী তাঁর ছোট বোন। এতদিন পর তার নাতনি এল!

'দিদি, কতদিন পর! তোর একটা ফোনও নেই যে খবর নেব!'

'সত্যি কী প্রাণবন্ত ছিলেন মানুষটা। সারাদিন যেন মাতিয়ে রাখতেন সব্বাইকে। দাদাবাবুও চলে গেলেন, টুকুর বাবা তো অনেক আগেই গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, অনেকদিন হয়ে গেল সব। ছাড়, তোরা কেমন আছিস?'

'হ্যাঁ, আমাদের কাটছে। ওই মেয়েকে নিয়ে নাজেহাল। পড়াশুনো করল, চাকরি করল, এখন বিয়ে করতে চায় না। বিদেশ থেকে এসে দুম করে চাকরি ছেড়ে দিল। বউমা, টুকু সবাই নাজেহাল।'

'তবু তো এল কেউ। তোরা সব্বাই আসতে পারতি।'

'টুকুর সময় কই। সারাদিন চাকরি, শেয়ার বাজার নিয়েই আছে। আর আমি নড়তেই পারি না। ওই মেয়েই নাছোড়বান্দা...কতদিন ধরে বলছে যাবে। ও নাকি গ্রাম-দেশের পুরোনো বাড়ি দেখবে। ছবি তুলবে। বিদেশে নাকি এমন বাড়িতে মিউজিয়াম হয়।'

'টুকু, বউমা কেমন আছে?'

'ভালোই। টুকুর ব্লাড প্রেশার। ওরা গেছে

ঘন জ্যোৎস্নার মতো সামান্য লাল চুল এখন জ্যৈষ্ঠের ফ্যাটফ্যাটে আকাশের মতো ফিকে। পরিপাটি ত্বকে অনেক বসন্তের পর এখন শীতের বলিরেখা। রং পুড়েছে। তবু দু'জনেই যেন আঁকড়ে আছে পরস্পরকে।

অমলাসুন্দরী চুপ করে থাকেন। কেমন আছিস জিজ্ঞাসা করতে বাধে তাঁর। নিজের ছোট বোন। এক সঙ্গে বড় হওয়া। তারপর সব কেমন দূরে সরে গিয়েছে। আজকের এই সামান্য খসখসে গলার বৃদ্ধা, তাঁর ছোটবোন, নিজের চুল বাঁধার আগে যার বিনুনি করতেন তিনি।

'হ্যালো,' রমলা আবার বলেন।

এক চোখ জিজ্ঞাসা নিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে নীপা, 'দিদা শুনতে পাচ্ছ না?'

নীপাই ধরে দিয়েছে ফোনটা। 'কীরে কোনও তো খবর দিস না। শুনলাম তোর নাকি হাঁটুতে ব্যথা। হাঁটতে কষ্ট হয়?' অমলা বলে ওঠেন।

'আর আমার কথা! তুই কী করিস সারাদিন একা একা। অত বড় বাড়িতে?'

'আমার আর কী! চলে যাচ্ছে। যে ক'টা দিন আছে। তোর দাদাবাবু যাওয়ার পর সবই ফাঁকা।' বেড়াতে। নীপা নেই বলে। ওই মেয়ে নিয়ে যা হল কয়দিন,' বলেই ত্রস্ত স্বরে বলেন রমলা, 'ওকে কিছু বলিস না যেন।'

'কী হয়েছে?' অমলা দেখেন নীপা বাইরের বারান্দায় ঝুঁকে কী যেন দেখছে।

'কী আবার হবে। অত ভালো চাকরি দুম করে ছেড়ে দিল। বলে কী করবে পরে ঠিক করবে। টুকুর তো ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেল। বউমা বাপের বাড়ির লোককে কী বলবে ভেবে নাজেহাল। রোজ ঝগড়া। আর ওই মেয়েরও অমন গোঁ। শেষে আমি বললাম যা ঘুরে আয়। তোর কথা বললাম।'

'ও। টুকুর শ্বশুর-শাশুড়ির কী খবর?' অমলাসুন্দরী কথা ঘুরিয়ে দিলেন, নীপা ঘরে এসে ঢুকেছে।

মাছ কাটছে সুভামা। মাটিতে বঁটি রেখে। ওই বাড়িতে প্রথমবার মাছ দেখছে নুটু। আনন্দে গড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে মুখ ঘষছে এর ওর পায়ে। নীপা এসে নুটুকে ধরে কোলে তুলে নিল।

'জানো দিদা, আমি যখন ফ্রাঙ্কফুর্টে থাকতাম তখন আমার সামনের অ্যাপার্টমেন্টে একটা ইন্দোনেশিয়ান কাপল থাকত। তাদের এমন একটা বিড়াল ছিল। আরও মোটা লাভ ক্যাটস।'

অমলাসুন্দরী সরু চোখে দেখছিলেন। হাফ প্যান্টের থেকে একটু ঢোলা পোশাকটা। হাঁটুর অনেক উপরে। তাঁর সামান্য অস্বস্তি হচ্ছিল।

'ফ্যাঙ্কফুট কোথায় গো?' সুভামা জিজ্ঞাসা করে।

'জার্মানি।'

'তুমি জার্মান গেছ?'

'হ্যাঁ জার্মানি, তার আগে কিছুদিন নিউইয়র্কে। তারপর একটা চাকরি নিয়েছিলাম। আর ভালো লাগল না। ভাবলাম একটা ব্রেক নেব।'

'বাবা!'

'ভাবছিলাম কী করা যায়। ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তোমার কথা এল। ভাবলাম একবার আসি। ওয়েস্ট বেঙ্গলের গ্রাম। রাস্টিক ভিলেজ লাইফ। সো আই কেম।'

'ভালো করেছিস', অমলাসুন্দরী হাসলেন, 'তবু তো কেউ এল।'

'হা হা। এইভাবে না মুম্বইতে কেউ মাছ কাটে না। সো নাইস। আমরা ছুরি দিয়ে কাটি। বেশির ভাগই কাটা মাছ। এটা কী মাছ?'

'এটাকে পাবদা বলে। তোর ঠাকুমা রাঁধে না?'

'ঠাকুমা, তুমি তো শুনলে নড়াচড়াই করে না। তবে আই গেস খেয়েছি। মা করে। আই অ্যাম নট ইউজড টু ইন সিয়িং র ফিশ।'

এতক্ষণ নুটু চোখ বুজে বসেছিল নীপার কোলে। এইবারে সুযোগ বুঝে ঝাঁপ দিল মাটিতে। দৌড়োল, পিছন পিছন নীপা।

'মেয়েটা কেমন গো? এত বড় মেয়ে কোন হায়া কায়া নেই।'

'তোর কী? বিদেশে গেলে লোকে এমন হয়।'

সুভামা চুপ করে গেল। মুহূর্তে তার মুখে খেলা করে গেল চোরা হাসি। বুড়ির নাতনিকে ভালো লেগে গিয়েছে।

দুপুর হলেই সামান্য রোদ প্রবেশ করে এখান সেখান দিয়ে। ছায়া আঁকে, ছবি আঁকে মেঝেতে, বাড়িটার শরীরে শরীরে। বসন্তকাল, রোদ যেন আরও একটু বেশি সময় ধরে ছুঁয়ে থাকে পৃথিবীকে। জড়িয়ে থাকে, সোহাগ করে। নীপা ঘোরে বাড়ির ভিতর, উঠোন দালানে। ছবি তোলে, কখনও বা এ ঘর ও ঘর ঘুরে ঘুরে দেখে পুরোনো আসবাব, ছবি।

সময় যেন আটকে আছে ঘরগুলোয়। মোটা থামে প্লাস্টার খসা লাল ইটের মতো উঁকি মারে অন্য একটা কাল। এমন কোথাও সে আসতে চেয়েছিল। শহর, ফেসবুক, রোজকার ব্যস্ততা থেকে দূরে। যেখানে নিয়ত মোবাইলের তাড়াহুড়ো নেই, নেই অ্যাসাইমেন্টের অনন্ত চাপ।

এমন করেও মানুষ থাকে তাহলে! বয়ে যাওয়া সময় নিয়ে, স্মৃতিতে ডুবে, প্রতিদিন পালটে যাওয়া বাইরের পৃথিবীকে ভুলে থেকে।

দুপুর হলেই সামান্য রোদ প্রবেশ করে এখান সেখান দিয়ে। ছায়া আঁকে, ছবি আঁকে মেঝেতে, বাড়িটার শরীরে শরীরে। বসন্তকাল, রোদ যেন আরও একটু বেশি সময় ধরে ছুঁয়ে থাকে পৃথিবীকে।

'হই! উঠিস না ওখানে। ক'দিন আগেও একটা চাপড় খসে পড়েছে।'

নীপা চমকে পিছনে তাকায়।

'ওমা! তুমি ঘুমোওনি। আমি দেখলাম তুমি শুয়ে আছ।'

'ঘুম হয় না। এমনি শুয়ে থাকি।'

'ওই দিকের ঘরটায় তালা কেন?'

'ওই ঘরে তোর দাদুর জিনিসপত্র আছে কিছু। বেশির ভাগই পুরোনো রেকর্ড, খোলা হয় না।'

'রেকর্ড? রেকর্ড মানে?'

'আগেকার দিনে ছিল গান শোনার। দেখি সনি?'

'এল পি। লং প্লেয়িং! দেখাও, দেখাও প্লিজ।'

অমলাসুন্দরী ম্লান হাসেন। অদ্ভুত মেয়েটা। কত সহজে বায়না করতে পারে একজন প্রায় অচেনা মানুষের কাছে। আঁচলের খুট থেকে চাবির গোছা বার করেন। 'নে খোল।'

এই ঘরটা যেন বুকে আগলে রাখেন তিনি। সৌরীন্দ্রমোহনের স্মৃতি। স্মৃতি আরও কত কিছুর। একত্র যাপনের, খুনসুটি মান-অভিমানের। জমা স্মৃতির এই ঘরে ধুলো জমার আগেই তা মোছা হয়ে যায়। ঝকঝকে পিন ভাঙা গ্রামোফোন, না বাজা লং প্লেয়িং স্টিরিও যেন এখুনি বেজে উঠবে। মূর্ছনা ফুটবে সুরের। এই বাড়িও যেন গমকে গমকে কেঁপে উঠবে চলে যাওয়া মানুষের কোলাহলে।

'ওয়াও! এত লং প্লেয়িং! বাজে এখনও? গ্রামোফোনটা বাজে?'

'নাহ্, অনেকদিন খারাপ হয়ে পড়ে আছে।'

'সারাও না কেন?'

'কে আর সারাবে, তোর ঠাকুরদা গিয়েছে। তার শখ রয়ে গিয়েছে শুধু।'

'ন্যাট কিংকোল। তুমি ন্যাট কিংকোল শুনেছ?'

'হ্যাঁ, ন্যাট কিংকোল, প্যাট বুন, তোর ঠাকুরদা শুনত।'

'ঠাকুরদা এই সব শুনত? এইখানে!'

অমলাসুন্দরী হাসেন। 'তুই গান শুনিস না?'

'হ্যাঁ, শুনি তো। ওই যে আইপডটা লাগাই কানে। আমার আইপডে প্রায় হাজার খানেক গান আছে।'

'হাজার খানেক। ওইটুকু যন্ত্রে!'

'হ্যাঁ। ল্যাপটপে আছে প্রায় ছয় জিবি।'

'ছয় জিবি? মানে?'

'ওহ্! হ্যাড অরবিন্দ বিন হিয়ার হি উড হ্যাভ বিন অ্যামেজড। উইশ আই কুড টেক দিস হোল স্পেস উইথ মি। ও মাই গড দিস ইস অসাম।'

'অরবিন্দ কে?'

'অরোবিন্দো না অরবিন্দ। আমার বয় ফ্রেন্ড। শিট।' বলেই জিভ কাটল নীপা। চোখ কপালে তুলে তাকাল অমলাসুন্দরীর দিকে।

অমলাসুন্দরী অবাক হলেন না। এই মেয়েটা তাঁকে অবাক করে না আর। তাঁর শুধু মনে পড়ে গেল প্রায় পনেরো বছর বয়সে তিনি যে দিন এই বাড়িতে প্রথম ঢুকেছিলেন সেই দিনটার কথা। কী রোগা ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন! টোপর পরা। সদ্য বিয়ে করা কনের দিকেও তাকাতে যেন লজ্জা পাচ্ছিলেন। অনেক লোক। মেয়েদের চাপা হাসির শব্দ, উলুর আওয়াজ। তিনি পায়ের দিকে তাকিয়েছিলেন। আলতা পরা পাগুলো। লাল আলতায় ডুবিয়ে পা ফেলছেন বাইরের দালানে। সৌরীন্দ্রমোহনের কপালে চন্দন ছিল। যেমন চন্দন তিনি নিজে হাতে এঁকেছিলেন তাঁর কপালে। চলে যাওয়ার দিন। প্রথম সেইদিন,

মধ্যরাত্রে সৌরীন্দ্রমোহন লজ্জা পাচ্ছিলেন কাছে আসতে। আর তিনি যেন স্থবির হয়েছিলেন। স্তব্ধ হয়েছিলেন, লজ্জায়, ভয়ে, আনন্দে।

'দিদা তুমি রাগ করলে না তো? অরবিন্দ আর আমি এক সঙ্গে চাকরি করতাম। আমাদের বাড়িতে সবাই জানে।'

অমলাসুন্দরী কী বলবেন। নীপার দিকে তাকিয়ে তিনি যেন দেখতে পাচ্ছিলেন নিজেকে। আরও অনেকদিন পর। কলকাতা থেকে কালো গাউন কিনে এনেছেন সৌরীন্দ্রমোহন। লেসের কাজ করা, ঘটি হাতা, অমলাসুন্দরীকে পরাবেন। সেদিন এই ঘরে গান বাজছিল। ন্যাট কিংকোলের গান। 'হোয়েন আই ফল ইন লাভ/ইট উইল বি ফর এভার/অর আই ইউল নেভার ফল ইন লাভ।' পুবের জানলা দিয়ে হালকা হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসছিল চাঁদের আলো। বাইরের স্তব্ধতা আর চাঁদ চোয়ানো ঘরে গ্রামোফোনের আওয়াজ। তখনও পলেস্তারা খসেনি। এই বাড়িও তখন যুবক।

'দিদা তুমি রাগ করলে?' অমলাসুন্দরীর ঘোর কেটে যায়।

'আরে না না। তোদের সময় অন্য। তোরা নিজেদের মতো বেছে নিতে শিখেছিস। এই ভালো।'

'তোমরা চা খাবে না? চা চাপাই?' সুভামা এসে দাঁড়ায়।

রাত হয়। খাওয়ার পর জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে নীপা। রাতের নরম আলোর আশ্চর্য উদ্ভাস নীপার শরীরে। হালকা হাওয়ায় তার চুলের গোছ কাঁপছে ধীরে ধীরে। অমলাসুন্দরী মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন। আর নীপা দেখছিল বাইরের পৃথিবীটাকে। দূরে পাঁচিল ঘেঁষে কচুবনের সারি। একটা কেঁদো কুকুর কী যেন খ াচ্ছে মুখ তুলে। খাওয়ার পর শরীর ঝাড়ল। আরও দূরে নারকেল গাছেদের সারি বেয়ে সামান্য পুকুরের উদ্ভাস।

'হ্যাঁরে, অরবিন্দর সঙ্গে তোর কতদিনের আলাপ?'

'তা অনেকদিন। বছর তিন-চার হবে।'

'তিন-চার বছরও অনেকদিন।' ভাবেন অমলাসুন্দরী। আশ্চর্য! জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর সঙ্গে আলাপ কী ভাবে?'

'অরবিন্দ ছিল আমার টিমে। আমার সিনিয়র। কথা বলত খুব। খুব মজার ছেলে। কথায় কথায় হাসত। আর ক্লায়েন্ট মিটিংয়ের আগে সবাই যখ ন খুব টেনস তখন অরবিন্দ হেঁড়ে গলায় গান গাইত। এত ফানি।'

'তারপর?'

হেসে ফেলল নীপা। ফরসা গাল বুঝি বা রক্তিমও হল কয়েক মুহূর্তের জন্য। রাতের আবছা নীলাভ রঙে সেই লাল বুদবুদের মতো ফুটে উঠেই যেন মিলিয়ে গেল।

'একদিন একটা মেল করল জানো। একটা মেল তাতে কিচ্ছু লেখা নেই। শুধু বড় করে ইংলিশে লেখা সো ট্রু। আর মেলের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট এলভিস প্রেসলির গান। কান্ট হেল্প ফলিং ইন লাভ উইথ উ।'

'বাব্বা। তুই কী করলি?'

'আমি কী করব। আমি তো অবাক। আমি সোজা ওর টেবিলে গিয়ে বললাম, এটার মানে কী? হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? বজ্জাত ছেলেটা কোথায় ভয় পাবে, তা না বলে কিনা, যা সত্যি তাই তো বললাম। আর আমি হেসে ফেললাম।

সেই শুরু।'

অমলাসুন্দরী মুচকি হাসলেন। সৌরীন্দ্রমোহনও ওইরকম ছিলেন, বেপরোয়া। নইলে সেই আমলে কেউ রাতবিরেতে বউকে গাউন পরিয়ে, ইংরাজি গান বাজিয়ে, বল নাচতে চায়।

'অরবিন্দের ছবি নেই তোর কাছে?'

'আছে দেখবে? দাঁড়াও, ল্যাপটপটা অন করি।'

ল্যাপটপ অন করে নীপা। ছবি বার করে। ফরসা সুঠাম দেহের যুবক। উজ্জ্বল চোখ। ঝকঝকে স্যুট পরা।

'বাহ্! ভারী সুন্দর দেখতে তো।'

নীপা ল্যাপটপটা ঘাঁটে, কী যেন খুঁজছে। বলে, 'দিদা গানটা শুনবে?'

'কোন গান?'

'বাহ্, ওই এলভিসের গান। যেটা অরবিন্দ পাঠিয়েছিল। তুমি এলভিসের গান শুনেছ?'

'না রে। আমার যা শোনা সব তোর দাদুর

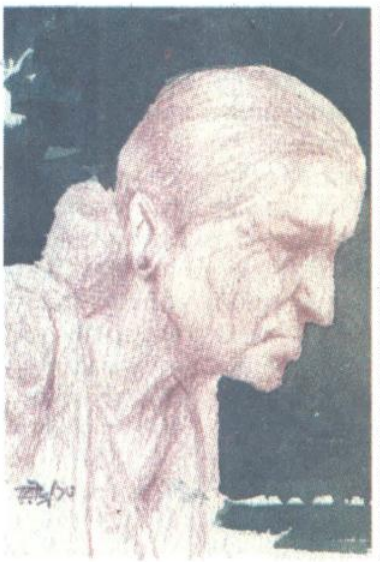

তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করেন মিলিয়ে গিয়েছে তাঁর চামড়ার ভাঁজ। যেন পনেরো বছরের অমলা, শিশুর মতো সরল, আবার নতুন বউয়ের মতো লাজুক, অপার বিস্ময়ে, নির্জন দুপুরে চরে বেড়াচ্ছে এই বিশাল বাড়িটায়।

কেনা।'

গান চালায় নীপা। শুধু গান নয় ভিডিও। এক আশ্চর্য সুন্দর কন্দর্পকান্তি যুবকের চেহারা ভাসে পর্দায়। কটা চোখ। লম্বা ঝুলপি। অত্যাশ্চর্য ভঙ্গিমা। জ্যাকেট পরে গান গাইছে। আর গানের টানে দুলছে যেন গোটা দুনিয়া। দুলে ওঠেন যেন অমলাসুন্দরীও।

'ওয়াইজ ম্যান সে অনলি ফুলস রাশ ইন
বাট আই কান্ট হেল্প ফলিং ইন লাভ উইথ ইউ'

গানের ভাষা বোঝেন না অমলাসুন্দরী। বোঝেন না অদ্ভুত উচ্চারণ। শুধু সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর যেন হালকা আমেজে ঢেকে দেয় গোটা বাড়িটাকে। সেই কণ্ঠ যেন চাঁদের আলোর মতো, ভারী বর্ষার পর মেঘের ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়ানো চোরা চাঁদের মতো, ঘন শীতের ভোরে ঘাসে লেগে থাকা কুয়াশার মতো।

'টেক মাই হ্যান্ড, টেক মাই ফুল লাইফ টু
ফর আই কান্ট হেল্প ফলিং ইন লাভ উইথ ইউ'

অমলাসুন্দরীর মনে হয় গানটা যেন তাঁকে মুড়ে দেয় কুহক আবরণে। মেঝেতে পড়ে থাকা পলেস্তারা যেন নিজে থেকেই শূন্যে উঠে আবার লেগে যায় দেওয়ালের গায়ে। ভেঙে পড়া কার্নিশ হঠাৎ ঋজু সুঠাম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় পুরোনো জায়গায়। খসে পড়া রং ঠিকরে বেরোয় অনেক ধুলোর আস্তরণ ভেদ করে। আর পুরোনো স্মৃতিতে নিভে যাওয়া বাড়িটা যেন পাড়ি দেয় আকাশে, মেঘের গায়ে গা ঘষটে ঘষটে যেন স্পর্শ করতে চায় আকাশের চাঁদ। সৌরীন্দ্রমোহনের কথা মনে পড়ে তাঁর। মনে পড়ে পুরোনো সব স্মৃতি। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করেন মিলিয়ে গিয়েছে তাঁর চামড়ার ভাঁজ। যেন পনেরো বছরের অমলা, শিশুর মতো সরল, আবার নতুন বউয়ের মতো লাজুক, অপার বিস্ময়ে, নির্জন দুপুরে চরে বেড়াচ্ছে এই বিশাল বাড়িটায়।

'লাইক আ রিভার ফ্লোজ শিওরলি টু দ্য সি
ডার্লিং সো ইট গোজ
সাম থিংস আর শিওরলি মেন্ট টু বি'

গান শেষ হয়। শুধু পুরোনো ঘড়ি, এগারোটার ঘণ্টা বাজিয়ে জানান দেয় সময় ফেরে না। ফিরতে পারে না। অমলাসুন্দরী চুপ। নীপাই কথা বলে যায় একনাগাড়ে।

'এই গানটা আমার আইপডেও আছে দিদা। এতবার শুনেছি। দিদা তুমি ল্যাপটপ চালাতে শিখবে? এই দেখো এই বোতামটা টিপলে অন হয়। এইভাবে, ধীরে ধীরে বুট হচ্ছে, মানে খুলছে।'

অমলা তাকিয়ে থাকেন।

অন্ধকার। সিঁড়ির ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে স্মিত আলো। অমলাসুন্দরী, একা হেঁটে উঠে যাচ্ছেন সিঁড়ি দিয়ে। মৃদু সুর চলকে নামছে জ্যোৎস্নার মতো। অমলা যেন সুরের টানে অন্ধ এগিয়ে যাচ্ছেন। উপরের ঘরটা, কালো গাউন পরা অমলা। গ্রামোফোনে একা ঘুরছে রেকর্ড। আর সামনে চুনোট ধুতি পরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। উপরে মুগার পাঞ্জাবি। ধুতির খুঁট লুটোচ্ছে মেঝেয়। তিনি মগ্ন। আতরের গন্ধ ভরে আছে ঘরটায়। আর সামান্য আলো কোথা থেকে যেন গড়িয়ে নেমেছে। অমলার পায়ের নূপুর শরীরে বাজছে, অথচ গানের শব্দে ঢেকে যাচ্ছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে হাত রাখলেন সেই পুরুষের কাঁধে। হালকা হাত রাখা। স্পর্শের উত্তাপে ভারী। মানুষটা পেছনে ফিরে তাকাল। চোখ রাখল চোখে। কটা চোখ। লম্বা ঝুলপি। অ্যালবার্ট কাটা চুলের নীচে দীর্ঘ কপাল। সেই কপালে হালকা চন্দনের ফোঁটা। অমলা শুধু স্মিত হাসলেন।

ভোর রাতে ঘুম ভেঙে যায় নীপার। চৈত্রমাসের রাত, শীত যেন চলে যাওয়ার পরেও অবকাশটুকু রেখে গিয়েছে। স্মৃতি যেন শীতের। নীপা কুণ্ডলি পাকিয়ে চাদরটা টেনে নেয়। দরজার ফাঁক দিয়ে হালকা নীল আলো। চাপা কণ্ঠে একটা গুনগুন ভেসে আসছে। নীপা উঠে বসে, আলতো করে গায়ে জড়িয়ে নেয় চাদর। দরজার ফাঁক দিয়ে চোখ রাখে বাইরে।

'দিদা!'

অমলাসুন্দরী চমকে ওঠেন। খুব সন্তর্পনে ল্যাপটপটা নিয়ে এসেছেন তিনি। কোনও মতে বোতাম টিপেছেন অন করার। তারপর বসে রয়েছেন স্থাণুবৎ। এরপর কী করতে হয় তিনি জানেন না। বসে বসে তিনি গানের সুরটা গাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলে, টিলের টোকায় সামান্য আলোড়ন যেমন, বৃদ্ধার বুকের নিঃশ্বাসে ততটুকুই সুর।

আমি। আমি, মানে, গানটা...। অমলা চোখ সরিয়ে নেন। তাঁর ফরসা গাল ল্যাপটপের নীল আলোয় মায়াময়। চোখের কোণে অল্প অশ্রুর উদ্ভাস।

নীপা তাকিয়েই থাকে। খোলা জানলার বাইরে, নারকেল গাছের ফাঁকে ঘষা ঘষা মেঘ লেগে আছে। নরম, বড় নরম। ❖ *অলঙ্করণ : রৌদ্র মিত্র*

বানভাসি

সুব্রত সেন

১৪

পুরোনো বাড়ির ভিতরটা অন্যরকম হয়। বাড়ির ভিতরে ঢুকলে অদ্ভুত এক ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়। সোঁদা গন্ধ। সেই গন্ধ নদীর ভালো লাগে। বুক ভরে শ্বাস টানতে ইচ্ছে করে।

মানিকের বাড়িটা বিরাট। এই রকম বাড়ি আজকাল দেখাই যায় না, এই সব এলাকাতে তো আরও নয়। নদীদের পুরোনো পাড়ায় অবশ্য এই রকম বড় বাড়ি এখনও কিছু রয়ে গিয়েছে, বাকিগুলোতে হাত পড়েছে প্রোমোটারের। প্রোমোটারদের তৈরি সব বাড়ি একই রকম দেখতে হয়। বাড়িতে ঢুকেই প্রথমে থাকে একটা লিভিং রুম। সেই লিভিং রুম থেকে বেডরুমগুলোতে যাওয়ার ব্যবস্থা। একটা কিচেনের দরজা। একটা বাইরের দিকের বাথরুমের। কখনও কখনও একচিলতে বারান্দাও থাকে। বাড়ির দাম অনুযায়ী ঘরের সাইজ হেরফের হয়। বাকি সব এক থাকে। কোনও বৈচিত্র নেই।

মানিকের বাড়িতে এলে নদীর মনে হয় এই বাড়ির মধ্যে আপনমনে ঘুরে বেড়ালে হঠাৎ করে একটা রহস্যময় সিঁড়ির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কিংবা একটা তালাবন্ধ ঘর। যার কথা বাড়ির কারও মনে নেই। সেই ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করে আছে অন্য এক রকম রহস্য। অতীতের কোনও স্মৃতিকথা। যা সবাই ভুলে গিয়েছিল।

সিঁড়িটা হয়তো নিয়ে যাবে মাটির তলার কোনও চোরকুঠুরিতে। সেখানে গুপ্তধনের বাক্সে থরে থরে সাজানো আছে নানারকম হিরেজহরত। মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অনেক অনেক সোনা। মানিকের বাড়িতে হয়তো এরকম আছে, মানিকরা জানেও না সেকথা!

অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় যাওয়ার থাকে না নদীর এখন আর। বাড়িতে আসার পথে টুক করে মানিকের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ছুটির দিনও অনেক সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাজির হয়ে যায় এখানে। মানিকের সঙ্গ তার ভালো লাগে। কোথাও তার মনে হয় এই মানুষটা অন্যরকম, বাকি আর পাঁচটা মানুষের মতো গতানুগতিক নয়।

মানিক আর অরুণার সংসারে কথা বলার লোক কম। সন্ধে পেরিয়ে নদী এলে তাদের দু'জনের ভালোই লাগে। নদী এসে মানিকদের সঙ্গে বসে চা খায়। অরুণা ডিমের অমলেট বানিয়ে দেয়। কখনও রাখালকে দিয়ে আনিয়ে রাখে ফিশ কাটলেট কিংবা ফিশ ফিঙ্গার। দোকান থেকে আনা কাটলেটের সঙ্গে এমনিতে পেঁয়াজ আর শশা কুচিয়ে স্যালাড ফ্রি দেওয়া হয়। সেই স্যালাড অরুণা নদীকে দেয় না কখনও। কাটলেটের সঙ্গে দেওয়া হয় বাড়িতে বানানো টারটার সস।

মানিকদের দেখতে খুব অদ্ভুত লাগে নদীর। বেতের সোফায় কী সুন্দর পাশাপাশি বসে থাকে তারা। একে অন্যের পিছনে লাগে, খুনশুটি করে। এই বয়সেও তাদের এত প্রেম! নদী তার বাবা-মা'কে কখনও পাশাপাশি বসে এইভাবে সময় কাটাতে দেখেনি। বাড়িতে থাকলে বাবা চুপ করে বসে খবরের কাগজ পড়ে। মা থাকে রান্নাঘরে নিজের খুঁটিনাটি নিয়ে।

খুব ছোটবেলায় নদীদের বাড়িতে একটা নিয়ম ছিল। রাতের খাবার খেতে সকলে একসঙ্গে বসত। রবিবার বা ছুটির দিনেও তাই নিয়ম। একসঙ্গে খেতে বসলে বাড়ির চারটে আলাদ লোক ওই সময়টুকুর জন্য একটা পরিবার হয়ে উঠতে পারে। এক সঙ্গে খেতে বসার রেওয়াজ হয়তো সে কারণেই।

একসঙ্গে খেতে বসার পাট এখন উঠে গিয়েছে। নদী সকালে অফিসে বেরিয়ে যায়, তখন কোনওরকমে কিছু একটা খেয়ে নিলেই হল। রাতে দেরি করে বাড়ি ফেরা, অনেক সময়েই বাইরে খেয়ে আসত নদী। রবিবার বেশিক্ষণ ঘুমোনোর পক্ষপাতী নদী, খাওয়াদাওয়ার রুটিন সে কারণে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে।

কলেজে যাওয়ার পর পুপুর রুটিনও পাল্টে গিয়েছে অনেক। পুপু ছোটবেলা থেকেই একটু পাড়া-বেড়ানি টাইপের। 'এখন টিউশন যাচ্ছি' বলে কোথায় সব কাটিয়ে আসে। পরিবারের একসঙ্গে সময় কাটানোর রুটিনের দিকে কারও কোনও খেয়াল নেই এখন আর।

মানিকের সঙ্গে মুখে মুখে অঙ্কের ধাঁধা নিয়ে খেলতে বেশ

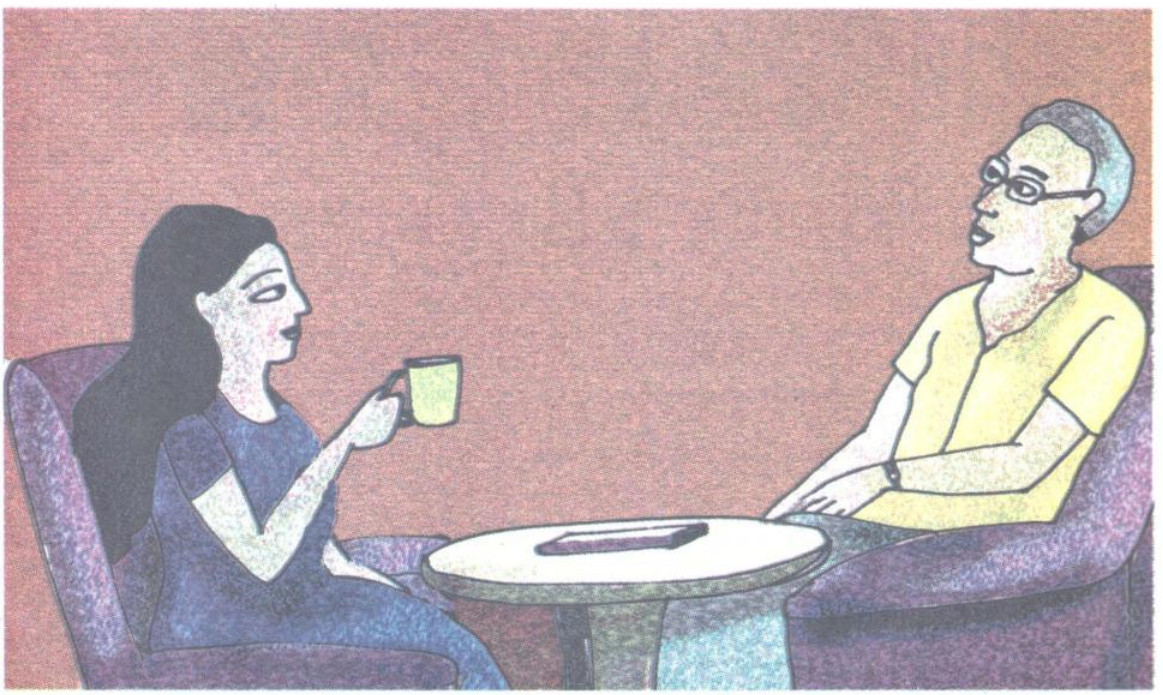

মজা লাগে নদীর। মুখে মুখে অঙ্কের ধাঁধা বানিয়ে ফেলতে পারে মানিক। অঙ্কের ধাঁধা নিয়ে নদী আগে কখনও মাথা ঘামায়নি। এখন শিখছে নতুন করে। অঙ্কের ধাঁধা হঠাৎ করে শুনলে মনে হয় খুব জটিল। কিন্তু ট্রিকটা কেউ বুঝিয়ে দিলে তখন আর জটিল মনে হয় না।

মানিক তাস নিয়েও ম্যাজিক দেখাতে পারে। ওই ম্যাজিক দেখে প্রথম প্রথম তাক লেগে যেত নদীর। ম্যাজিকটাকেও মনে হত ধাঁধার মতো। কিন্তু ম্যাজিকটা কী করে হচ্ছে জেনে গেলেই সোজা। ধাঁধার মতোই ব্যাপার।

ট্রেতে করে একটু আগে চা দিয়ে গিয়েছে রাখাল। চায়ের সঙ্গে মুরুক্কু। স্পেশাল এই মুরুক্কু অরুণা আনিয়েছে দক্ষিণ ভারত থেকে। মুরুক্কু খেতে ভালো লাগে নদীর। খেতে খেতে খোঁজ নিয়েছে কলকাতায় কোথাও পাওয়া যায় কি না। পাওয়া গেলে বাড়ির জন্য নিয়ে যেতে চায়। বাবা তারই মতো বারে বারে চা খেতে ভালোবাসে। চায়ের সঙ্গে মুরুক্কু খেতে পারবে।

চা খেয়ে অরুণা উঠে পড়ল। পাশের ঘরে তার সুটকেস আধখোলা হয়ে পড়ে রয়েছে, সেই সুটকেস গোছাতে হবে তাকে। কাল সকালে উঠে অরুণা যাবে লেক মার্কেটে তার মামাবাড়িতে। মামার শরীর ভালো না, প্রায় আশি বছর বয়স হয়েছে তাঁর, মামার সঙ্গে থেকে তাঁর পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে।

এ ছাড়াও বিয়ের কিছুদিন আগে থেকে মামাবাড়িতে গিয়ে থাকবে বলেই ঠিক করেছে অরুণা। মামাবাড়ি থেকে বিয়ের রিসেপশনে আসবে। বর-বউ এক বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিয়ের রিসেপশনে যাচ্ছে এই ব্যাপারটা অরুণার ঠিক পছন্দ নয়। কেমন যেন দৃষ্টিকটু লাগে। বিয়ের দিন দু'টো আলাদা বাড়ি থেকেই যাওয়াই ভালো দেখায়। বিয়ে হওয়ার পর, রিসেপশনের পালা সাঙ্গ করে একসঙ্গে দু'জনে আবার এই বাড়িতে ফিরবে।

মানিক আর অরুণা মিলে বিয়ের একটা দিন মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছে। লেকমার্কেটের কাছে একটা হলে বিয়ের রিসেপশন হবে, সেই ব্যাপারেও অগ্রিম দিয়ে একটা বুকিং সেরে এসেছে। এই সপ্তাহে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে তাদের নোটিস দেওয়ার কথা। বিয়ের ঠিক আগেই মামার শরীর খারাপ হওয়াতে অরুণার মনটা একটু খচখচ করছে। এখন ক'দিন মামাবাড়িতে গিয়ে থাকাই ভালো। এই বাড়ি পুরোপুরি গোছানো হয়ে গিয়েছে, মানিকের একা থাকতে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

অরুণা উঠে যাওয়ায় নদীও উঠে পড়তে যাচ্ছিল। মানিক বলল, 'এখনই চলে যাচ্ছ কেন? বোসো না আরেকটু। তোমার সঙ্গে তো আলাদা করে কথাই হয় না আর! তুমি থাকলে আমার ভালো লাগবে।'

নদী হাসল। বলল, 'আজকাল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করছি মানিকদা। আমার জীবনের রুটিনটা খুব এলোমেলো, আস্তে আস্তে সেটা ঠিক করে নেওয়ার চেষ্টা করছি, জানো তো?'

'আসলে কী জানো তো, তুমি এলে আমার খুব ভালো লাগে। আই এনজয় ইয়োর প্রেজেন্স।'

হাসতে হাসতে কথাগুলো বলল মানিক। কথায় কিছুটা স্নেহের সুর। এই লোকটার সাহচর্য নদীরও ভালো লাগে খুব। পুরুষালি বলিষ্ঠ চেহারা। বোতাম-খোলা জামার ভিতর থেকে বুকের রোম উঁকি মারে। এই লোকটাকে দেখলে মনে হয় লোকটা চিরযৌবনের অধিকারী। যে কোনও মানুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা এর সহজাত।

নদী বলল, 'আমারও ভালো লাগে তোমাকে। সেই জন্যই তো বারবার করে চলে আসি এখানে। তোমাদের দেখলে আমার মন ভরে যায়। আমি মুগ্ধ হয়ে তোমাদের দেখি। দু'জনকেই। আই এনভি অরুণাদি। এই বয়সেও এত গ্রেস, আমি তো বুড়ি, থুত্থুরি হয়ে যাব!'

'হবে না। তোমার মধ্যে একটা অদ্ভুত কিছু আছে। মোর দ্যান অরুণা। সামথিং বিয়ন্ড গ্রেস। দ্যাট অ্যাট্রাক্টস মি আ লট।'

নদী হাসল। নিজের প্রশংসা শুনলে যে কোনও মানুষেরই ভালো লাগে। নদী তার ব্যতিক্রম নয়। উপলও তার রূপের প্রশংসা করত। কিন্তু সেটা মেকি। মানিকদার কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা আছে। সে বানিয়ে বলছে না। তা ছাড়া এই লোকটা তার বাবার বয়সি, তাকে দেখলেই নদীর মনটা অন্যরকম ভালো লাগায় ভরে ওঠে।

নদী বলল, 'তোমাকেও আমার খুব ভালো লাগে মানিকদা। সেই কারণেই তো রোজ একবার করে ঢুঁ মেরে যাই।'

মানিক হাসল। বলল, 'বারীদ বলছিল তোমার নাকি বিয়ের চেষ্টা চলছে বাড়ি থেকে? সেটা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ। বাবা মাঝেমাঝে হঠাৎ করে আমাকে নিয়ে টেনশন করতে থাকে। আমি অবশ্য বিয়ে করতে চাই না। মা'কে বলেছি, যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে তোমার মতো ছেষট্টি বছরে গিয়ে করব।'

'কেন তুমি বিয়ে করতে চাও না কেন? অদ্ভুত মেয়ে তো তুমি! সেটা কি তোমার গোপন প্রেমিকের জন্য?'

নদী কিছু বলল না। গোপন প্রেমিকের সঙ্গে তার সম্পর্কের ইতি ঘটে গিয়েছে, তার মুখ দেখে মানিক সেটা বুঝতে পারেনি। মুখ দেখে সব কথা মানিক বুঝে যায়, নদীর এ ধারণাটা ঠিক নয় তাহলে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নদী বলল, 'আমার কোনও গোপন প্রেমিক নেই। আমি কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্কে যেতেও চাই না আর। আমি যা আছি বেশ আছি।'

'কিন্তু কখনও না কখনও মানুষের একজন সঙ্গী দরকার হয়।'

'আমার দরকার নেই। তোমার মতো সঙ্গী সবার জোটে না। বিয়ে করেও জীবনে শান্তি থাকে না। লোকে অন্যের বিশ্বাসে আঘাত দেয়। তার থেকে একা একা থাকাই ভালো।'

দুম করে মিলনের কথা মনে পড়ে গেল মানিকের। মিলন তাকে বিশ্বাস করেছিল। সেই বিশ্বাসভঙ্গ ঘটিয়েছে মানিক

মানিক আর অরুণা মিলে বিয়ের একটা দিন মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছে। লেকমার্কেটের কাছে একটা হলে বিয়ের রিসেপশন হবে, সেই ব্যাপারেও অগ্রিম দিয়ে একটা বুকিং সেরে এসেছে। এই সপ্তাহে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে তাদের নোটিস দেওয়ার কথা।

বাঙালি আন্দাজে ঈশান বেশ লম্বা। তার চেহারা অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে উঁকি মারে। পুপু সে কারণে দেখতে পেয়েছে ঈশানকে। দূর থেকে হাত নেড়েছে ঈশানকে। তারপর বন্ধুদের এড়িয়ে এগিয়ে আসছে ঈশানের দিকে।

নিজে। যদিও ইচ্ছে করে করেনি সেটা। এখন নদীকে সামনে দেখতে তার ভালো লাগছে। ইচ্ছে করছে নদীর হাতটা একটু ধরার। নদীর ঠোঁট একটু ভেজাভেজা। সে কি পারে নদীর ঠোঁটে আলগোছে একটা চুমু খেতে?

পারে না। তাহলে সেটা বিশ্বাসভঙ্গ হবে। নদীর প্রতি হবে। অরুণার প্রতিও হবে। কিন্তু মানিকের খুব ইচ্ছে করছে যে! তার তো কয়েকদিন ধরে নদীকে ছুঁয়ে দেখার খুব লোভ হচ্ছে। এই লোভ সামলাতে পারবে তো মানিক?

নদী চলে যাওয়ার সময়ে মানিক একটু বিষন্ন বোধ করল। বলল, 'অরুণা থাকবে না কিছুদিন। আমি একা একা থাকব। তুমি আসবে তো নদী?'

নদী হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই আসব। তোমার সঙ্গে সময় কাটাতে আমার ভালো লাগে। কত অঙ্কের ধাঁধা জানো তুমি! আমি নিজেও এত জানতাম না।'

মানিক চুপ করে তাকিয়ে রইল নদীর চোখের দিকে। তারপর বলল, 'আমার যদি বয়সটা কম হত, আমি তোমাকে প্রোপোজ করতাম বোধহয়, জানো?'

নদী হেসে বলল, 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজিও হয়ে যেতাম। হু নোজ!'

নদী চলে যাওয়ার পর বসার ঘরের সোফাতেই কিছুক্ষণ বসে রইল মানিক। নদীর শরীরের প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ বোধ হচ্ছে। রোজ সন্ধেবেলা নদী এসে তার যৌবন নতুন করে ফিরিয়ে দিচ্ছে। নদী তার থেকে প্রায় পঁয়তিরিশ বছরের ছোট। নদীর প্রতি তার এই আকর্ষণ কি অন্যায়? নিশ্চয় তাই, নইলে এর কথা সে কাউকে বলতে পারবে না কেন?

উপরের ঘর থেকে অরুণা ডাকছে। তাকে সুটকেস গোছানোয় সাহায্য করতে হবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মানিক উঠে পড়ল সোফা থেকে।

সেই রাতে মানিকের ঘুম আসছে চাইল না। বারবার উঠে উঠে সে জল খেল। শেষ রাতের দিকে ছাড়াছাড়া ঘুমের মধ্যে সে মিলনকে স্বপ্ন দেখল। পুলিশ ভ্যানের ভিতর থেকে জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে মিলন। বলছে, 'বিশ্বাসভঙ্গ করিস না মানিক, বিশ্বাস ভেঙে গেলে মানুষের আর কীই বা থাকে?'

মোড়ে হঠাৎ করে পুপুকে দেখতে পেল ঈশান। পুপুর সঙ্গে আরও কয়েকটা সমবয়সি ছেলেমেয়ে, তাদের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে গল্প করতে করতে পুপু হেঁটে যাচ্ছে ফুটপাত ধরে। পুপুকে একটু লম্বা দেখাচ্ছে, ঈশান তার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল পুপু নতুন জুতোটা পরেছে। জুতো পরার গর্বে তার হাঁটার ভঙ্গি পাল্টে গিয়েছে যেন!

ওই দঙ্গলের একটা ছেলে সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়েছে। সিগারেট কিনে দড়ির আগুন থেকে সেটা ধরাচ্ছে এখন। দলের বাকি সবাই সে কারণে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পুপুও দাঁড়িয়ে পড়ে মিটিমিটি তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক।

বাঙালি আন্দাজে ঈশান বেশ লম্বা। তার চেহারা অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে উঁকি মারে। পুপু সে কারণে দেখতে পেয়েছে ঈশানকে। দূর থেকে হাত নেড়েছে ঈশানকে। তারপর বন্ধুদের এড়িয়ে এগিয়ে আসছে ঈশানের দিকে।

হাসিমুখে ঈশানের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল পুপু। জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপারটা কী? আপনি কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলেন বলুন তো! আপনার ওপর আমি খুব রেগে আছি কিন্তু জামাইবাবু!'

ঈশান বলল, 'রেগে আছ কেন শালিবাবু? আমি আবার কী করলাম?'

'এই যে সেদিন এত কথা হল! ঠিক হল যে অফিসের পর আপনি দিদিকে নিয়ে ঘুরতে যাবেন? শহর দেখবেন? তার কী হল?'

'কথা তো হল, কিন্তু এগোল না কিছু। আসলে নিজেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। শিলিগুড়ি গিয়েছিলাম একটু।'

'শিলিগুড়ি গিয়েছিলেন কেন? ওখানে আবার কী আছে?'

'ওখানে আমার আস্ত একটা মামাবাড়ি আছে। কলকাতা আসার পর তাদের সঙ্গে একটু দেখা না-করলে কি চলে? তা ছাড়াও অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করছি। সেটাও একটা কারণ।'

'কী নিয়ে আবার চিন্তা করছেন? আসলে কাজটা আগে সারুন। তারপর অন্য সব ব্যাপারে ভাববেন!'

ঈশান হেসে উঠল শব্দ করে। বলল, 'আসল কাজটা বুঝি তোমার দিদিকে পটিয়ে ফেলা?'

'তা-ই তো! নইলে আর কী বলছি। এখন আপনার সময়টা ভালো যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে আমার, এই সময়ে দেরি করবেন না একদম।'

'কী করে বুঝলে আমার সময়টা ভালো যাচ্ছে?'

'দিদি আজকাল সন্ধ্যা-সন্ধি বাড়ি ঢুকে পড়ছে। আগে এরকম করত না। অনেক সময়েই কার সঙ্গে একটা অফিসের পার্টিতে চলে যেত। তারপর ফিরত অনেক রাতে। মদ খেয়ে আসত জানেন? চুপিচুপি আমাকে দরজা খুলে দিতে বলত, হি হি হি হি!'

ঈশান বলল, 'তাই? তোমার দিদিকে দেখে একদম বোঝা যায় না তো যে পার্টি-টার্টিতে যায়। মনে হয় খুব গম্ভীর, সে কোনও সময়ে বকে দিতে পারে!'

'বাইরে থেকে ওরকম মনে হয়। রাহুলও তাই বলে। পাড়া দিয়ে রিকশা করে যখন যায় তখন কারও দিকে তাকায় না রাহুলরা গান গাইলেও তাকিয়ে দেখে না!'

'রাহুলটা আবার কে?'

'আছে একজন, আমাদের পাড়ায়। খুব ভালো গান গায়। আমরা ঠিক পালিয়ে মুম্বই চলে যাব। সেখানে রাহুল গান গেয়ে খুব নাম করবে। আমি কিছু একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নেব সেখানে। মুম্বইতে চাকরি পেয়ে যাব, কী বলেন?'

'তা হয়তো পেয়ে যাবে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার কী দরকার? এমনিই তো যেতে পার!'

'ওরে বাবা, এমনি কী করে যাব? বাড়ি থেকে ছাড়বে নাকি? রাহুল তো পড়াশুনাই ছেড়ে দিয়েছে গান গাইবে

বলে। ওকে বিয়ে করলে বাড়ি থেকে রাজি হবে নাকি? তাই পালানো ছাড়া উপায় নেই কোনও, হি হি হি!'

'বাব্বা! দারুণ প্ল্যান তো তোমার! কাউকে বলেছ নাকি এসব কথা?'

'না না, আপনাকেই শুধু বললাম। সেই জন্যই তো চাইছি দিদি তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ফেলুক। দিদি বিয়ে না করলে পালাতে পারছি না যে!'

'কেন? দিদির বিয়ের সঙ্গে তোমার পালানোর কী সম্পর্ক?'

'আরে, এটাও বুঝলেন না? আমি যদি একবার পালিয়ে যাই, দিদির আর বিয়ে হবে নাকি? যার বোন বাড়ি থেকে পালিয়েছে তার নিন্দে হয়। তাকে কেউ বিয়ে করে না। সেই জন্যই তো আপনাকে তাড়া দিচ্ছি বিয়ে করার জন্য। আপনি কিছু না করলে আমার লাইন ক্লিয়ার হচ্ছে না যে!'

'ওরেব্বাবা, তাহলে তো তোমার জন্যই আমার কিছু একটা করা দরকার মনে হচ্ছে। কিন্তু কী করা যায় বলো তো? তোমার দিদি যা গম্ভীর টাইপের, দিদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে কি না তাই তো বুঝতে পারছি না!'

'ওই যে বললাম, দিদি বাইরে গম্ভীর। আসলে সে রকম নয়। একটু গোলমেলে প্রকৃতির। কেন এরকম কেউ জানে না। ওসব আস্তে আস্তে বুঝে যাবেন। কিন্তু তার আগে বলুন তো, দিদিকে আপনার পছন্দ হয়েছে কি না!'

'পছন্দ তো হয়েছে! কিন্তু কী করব সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'অন্যরকম একটা কিছু করুন। আপনি যে ঠিক সাধারণ মানুষ নন সেটা দিদিকে বোঝাতে হবে। খুব সাধারণ টাইপের লোকদের দিদি একদম পছন্দ করে না।'

ঈশান ভুরু কুঁচকে তাকাল পুপুর দিকে। বলল, 'এই তো মুশকিলে ফেললে। আমি যে সাধারণ একটা মানুষই। অসাধারণ হতেও চাই না।'

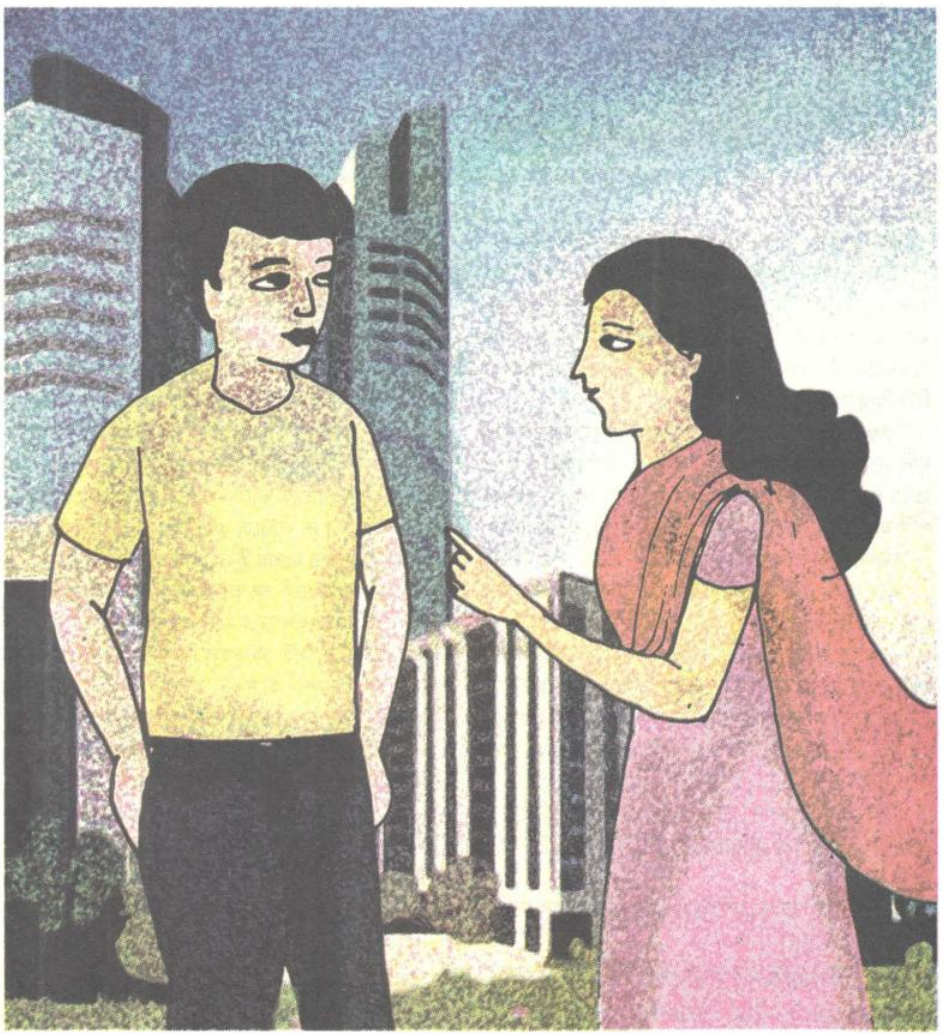

এই শহর নিয়ে ঈশানের মনে অনেক কৌতূহল আছে। একটু একটু করে সেই কৌতূহল নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছে ঈশান। শহরে দেখা কয়েকটা ঘটনার ছাপ যেন থেকে গিয়েছে ঈশানের অবচেতনে।

'ও সব বললে চলবে না। অন্যরকম কিছু একটা করে ফেলুন দেখি চট করে'।

'কী করা যায়, সেটাই তো আমার মাথায় আসছে না।'

'এমন একটা কিছু যাতে দিদি আপনার প্রেমে পড়ে যায়! আসলে এই পাত্রী দেখে বিয়ে করার ব্যাপারটা দিদি কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। সেই কারণে দিদি আপনাকে 'হ্যাঁ' বলতে পারছে না। যদি প্রেমে পড়ে, তাহলে দিদি কিন্তু আপনাকে হ্যাঁ বলে দেবে।'

'কিন্তু মেয়েরা কী করে প্রেমে পড়ে সেই ব্যাপারটাই ঠিক বুঝি না ভালো করে। আসলে আমার সে-রকম কোনও গুণও নেই যে মেয়েরা প্রেমে পড়বে। আমি গানও গাইতে পারি না, তোমার দিদিকে নিয়ে পালিয়েও যেতে পারব না।'

'হুম। কবিতা লিখতে পারেন?'

'ওরে বাবা, না! দিদিকে পটাতে গেলে কবিতাও লিখতে হবে নাকি?'

'লিখলে ভালো হত। কবিতার মধ্যে বেশ একটা প্রেম-প্রেম ব্যাপার থাকে, তাতে দিদি হয়তো খুশি হত।'

'কবিতা বাদ দিয়ে বলো। গদ্য লিখলে হয় না? ধরো, তোমার দিদিকে একটা প্রেমপত্র লিখলাম? সেটা যদি পোস্ট করে পাঠিয়ে দিই?'

'চেষ্টা করতে পারেন। তবে বানান ভুল হলে দিদি রেগে যায় খুব। তখন কিন্তু প্রেম করতে দিদি কিছুতেই রাজি হবে না।'

'ইংরেজিতে লিখব। স্পেলচেক চালিয়ে বানান-টানান সব ঠিক করে নেব।'

'কম্পিউটারে কেউ চিঠি লেখে নাকি? চিঠি হাতে লিখতে হয়।'

'তাহলে হাতেই লিখব। ডিকশনারি দেখে সব বানান চেক করে নেব।'

'তাহলে ঠিক আছে! ঠিকানা জানেন আমাদের?'

'সে জোগাড় করে নেব। রাসবিহারীবাবু আমার মেসোমশাইয়ের ছোটবেলার বন্ধু।'

'না, চিঠি লিখলে পোস্ট করবেন না। আমাদের ওখানে ভীষণ চিঠি হারায়। আপনি বরং চিঠি লিখে আমার হাতে দিয়ে দেবেন। আমি দিদিকে দিয়ে দেব।'

'দিদি রেগে যাবে না তাতে?'

'রেগে যাবে কেন? প্রেমপত্র তো ভাই-বোনের হাত দিয়েই পাঠানোর নিয়ম।'

'এ রকম নিয়ম আছে নাকি?'

'আছে তো! বাপ্পা তো রাহুলের হাত দিয়েই প্রিয়াঙ্কাকে চিঠি পাঠিয়েছিল। সেটা পড়েই প্রিয়াঙ্কা পুরো ফ্ল্যাট।'

'বাঃ, দারুণ তো। কিন্তু বাপ্পাই বা কে, প্রিয়াঙ্কাই বা কে?'

'প্রিয়াঙ্কা রাহুলের বোন। এখন বাপ্পার সঙ্গে প্রেম করছে। চিঠিতে অবশ্য বানান ভুল ছিল অনেক, আমি দেখেছি। আপনি বানান ভুল করবেন না কিন্তু।'

'বেশ করব না।'

'বন্ধুরা ডাকছে। আমি যাচ্ছি এখন। চিঠি লেখা হলেই আমায় ফোন করবেন।'

'করব।'

'আর দিদিকেও ফোন করবেন। দিদির সঙ্গে ঘুরতে যাবেন বলেছিলেন, সেটা ভুলে যাবেন না।'

'ভুলব না।'

পুপু চলে যাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ একা একা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইল ঈশান। উপভোগ করতে চাইল শহরের বিকেলটাকে। গত কয়েকমাসে এই শহরটাকে সে একটু একটু করে চিনছে। শহরটাকে তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। দিল্লি এবং বিদেশের শহরে থেকে এসে ঈশানের যে শহরটাকে ভালো লাগবে তা সে আগে বুঝতে পারেনি। ভালো না লাগলে এই শহর ছেড়ে আবার চলে যাবে এমনটাই তার মাথায় ছিল। এখন মনে হচ্ছে এই শহরে থাকাই যায়, শহরটাকে সে আপন করে নিতে পারবে।

এই শহর নিয়ে ঈশানের মনে অনেক কৌতূহল আছে। একটু একটু করে সেই কৌতূহল নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছে ঈশান। শহরে দেখা কয়েকটা ঘটনার ছাপ যেন থেকে গিয়েছে ঈশানের অবচেতনে। তার ছোটবেলায় দেখা ঘটনা। মা মারা যাওয়ার আগে। ওই বয়সের কথা ভালো করে মনে থাকার কথা নয় কারও। কিন্তু ঈশানের আছে। এখনও স্বপ্নে নানারকমভাবে উঁকিঝুঁকি মেরে এসে যায় সেই ঘটনাগুলো।

বাড়ি ফিরে নিজের টেবিলে খাতা-পেন নিয়ে লিখতে বসল ঈশান। রোজকার ঘটনা সে তার ডায়রিতে তুলে রাখে, এ তার অনেকদিনের স্বভাব। এখন সে অবশ্য ডায়রি লিখছে না। সে একটা চিঠি লিখতে বসবে। ❖ *ক্রমশ*

অলঙ্করণ : দেবযানী

বসন্ত উৎসব

ঋতব্রত ভট্টাচার্য

তৃণাই এগিয়ে এল। হয়তো অনর্ঘ্যর অস্বস্তিটা সে বুঝতে পেরেছে।—'আরে অনর্ঘ্যদা কবে এলে? বসন্ত উৎসবে?' অনর্ঘ্য কেমন জানি আমতা আমতা করছে। হয়ত সে বুঝে উঠতে পারছে না এই মুহূর্তে কী তার করা উচিত।

কুড়ি

তৃণা আবার বলে উঠল—'বউদি বুঝি? অনর্ঘ্যদা বৌদির সঙ্গে আলাপ করবে না?'

অনর্ঘ্য দেবযানীর দিকে তাকাল। দেবযানী তৃণাকে দেখছে। যেমন একজন মহিলা অন্য একজন মহিলাকে যেমন করে নিরীক্ষণ করে। বুঝে নিতে চায় সে কে। কোথা থেকে এসেছে। অচেনা নারীর প্রকৃতি।

—দেবযানী, এই হল তৃণা। আমাদের ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। তুখোড় মেয়ে।

—নমস্কার বউদি। আমার নাম তৃণা। তুখোড়-ফুখোড় নই—স্যারের এক ফাঁকিবাজ ছাত্রী। বলতে পারো স্যারকে খুব জ্বালাই। তোমার কথা অনেক শুনেছি। শান্তিনিকেতন কেমন ঘুরলে বলো? দেবযানীও তৃণার সঙ্গে কথা বলা শুরু করল। কেমনভাবে সকাল বেলায় সে অনর্ঘ্যকে পাকড়াও করে বিশ্বভারতী দেখতে বেরিয়েছে সে কথাও জানাল, তৃণা আর দেবযানীর কথা মাঝে অনর্ঘ্য ফস করে একটা সিগারেটও ধরিয়ে ফেলল। এ ছাড়া তার আর কিছু করার ছিল না। অনর্ঘ্য দাঁড়িয়ে ভাবছিল—কী সাঙ্ঘাতিক পরিস্থিতি। অথচ তৃণা কত সুন্দর হ্যান্ডেল করছে। তৃণার মোবাইলে দশ মিনিটও হয়নি, তার একটা এসএমএস ঢুকেছে। এস এম এসে কতবার জানিয়েছে যে সে তৃণার সঙ্গে কথা বলতে চায়। তৃণা নিশ্চয়ই তার এসএমএস পড়েছে। কিন্তু অভিমানে কোনও উত্তর দেয়নি। অথচ এখন এই মেয়েটাকে দেখে কে বলবে ভিতরে ভিতরে তার অভিমানের এত জ্বালা? তৃণাকে হঠাৎ দেখে অনর্ঘ্যর ভয় হয়েছিল। হয়তো ভেবেছিল একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু তৃণাই গোটা পরিস্থিতি পাল্টে দিল। অনর্ঘ্য মনে মনে তৃণার এই ম্যাচিওরিটির তারিফ করল। অনর্ঘ্যর সঙ্গে এমন ব্যবহার করল যে মনে হচ্ছে সত্যি সে যেন এক সাধারণ ছাত্রী। অনর্ঘ্যর মনে হল প্রাচীন সেই কথাটা কত সত্যি। মেয়েদের মন 'দেবাঃ না জানন্তি'।

'না বৌদি, তোমার ঘোরো। আমি কাবাব মে হাড্ডি হতে চাই না।'—হেসে বলল তৃণা।

অনর্ঘ্যর কেন জানি মনে হল এই 'কাবাব মে হাড্ডি' কথা কথাটার মধ্যে কোথায় জানি একটা শ্লেষ জড়িয়ে আছে। তৃণা অনর্ঘ্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার একটা ছোট্ট কাজ আছে এদিকে। তোমাদের সময় নষ্ট করব না। বাই।'

সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তবু জিনস আর সাদামাটা কুর্তী পরা সপ্রতিভ মেয়েটাকে বেশ লাগল দেবযানীর। তবে তৃণা বলল, 'বৌদি তোমার কথা অনেক শুনেছি'—কেমন জানি খটকা লাগল দেবযানীর। অনর্ঘ্য কি তার কথা ক্লাসে বলে? কেন বলবে? তবু কথাটা শুনে ভালোও লাগল তার। একটা আনন্দে বুকটা ভরে গেল। দেবযানীর হঠাৎ মনে হল তাহলে তার সেই অনর্ঘ্য এখন অনর্ঘ্যতেই আছে। অনর্ঘ্যর হাত জড়িয়ে ধরে সে আবদার করল—'চলো না সুবর্ণরেখায় কী বই আছে দেখি।' ওরা সুবর্ণরেখার দিকে এগোল।

দূর থেকে তৃণা স্যার আর তার স্ত্রীকে দেখল। মনে মনে

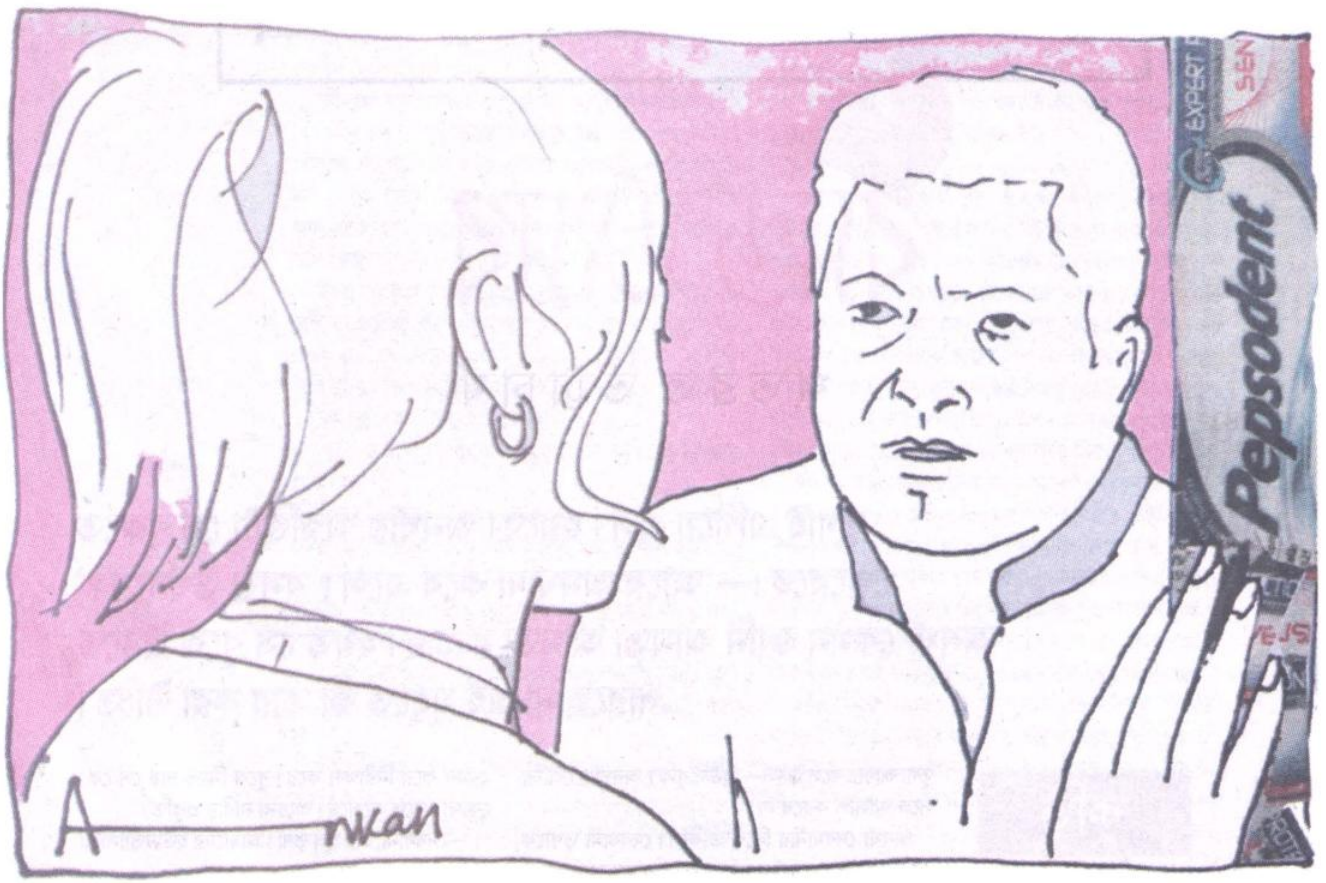

সে বলল বাঃ! দু'জনকে তো মানিয়েছে বেশ।

দেবযানীকে দেখে সত্যি মনে হচ্ছে সে খুব খুশি। মন খচ খচ করা রহস্যময় সেই চুল, তৃণার কথায় খটকা লাগা এক মুহূর্তে যেন কোথায় লীন হয়ে গেল। মাঝে মাঝে মেয়েরা যে কত অল্পতেই খুশি হয়ে যায়।

ঋতৃণ আর শুভশ্রী দু'জনে এখন সাঁওতাল গ্রামে ঢুকে পড়েছে। আদি অকৃত্রিম নারী-পুরুষের ভিড়ে তারাও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির বুকে সহজ সরল নারী-পুরুষের মতন এমন সৌন্দর্য আর কী থাকতে পারে।

মোহনা ঠিক করল আজ দুপুরে সে একটা 'পাওয়ার ন্যাপ' নিয়ে নেবে। রাত্রে আবার একটা পার্টি। অনেক রাত পর্যন্ত জাগতে হবে কিনা!

বোলপুর স্টেশনে আরও একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। দলে দলে লোক নামছে। ক্রমেই শান্তিনিকেতনে ভিড় রেকর্ড ছুঁতে চলেছে। কে জানে এখনও আরও কত লোক রাস্তায় আছে?

হয়তো এসব দেখে কোথা থেকে ডেকে উঠল একটা কোকিল। বড় সুন্দর সে ডাক। বসন্ত যেন আজ সত্যি জাগ্রত... বসন্ত যে আজ ডাক দিয়েছে।

ও আমার চাঁদের আলো

দেখতে দেখতে সন্ধে নামল। লোকে লোকারণ্য গোটা শান্তিনিকেতন। গৌর প্রাঙ্গণে হাজির ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আশ্রমিকরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে সান্ধ্য বৈতালিক। ওরা সবাই সাদা পোশাকে হাজির। গৌর প্রাঙ্গণ থেকে শান্তিনিকেতন বাড়ি, ছাতিমতলা, আম্রকুঞ্জ গোটা আশ্রম চত্বর প্রদক্ষিণ করবে এ মিছিলটা। চাঁদের আলো মেখে, 'ও আমার চাঁদের আলো' গাইতে গাইতে ওরা যাবে। বোকা ট্যুরিস্টদের অনেকেই ব্যস্ত ছবি তুলতে। জ্যোৎস্নার আলোতেও গর্জে উঠছে তাদের ফ্ল্যাশ। অভিষিক্তা, লিনা, শুভশ্রী, নীল, অবিনাশ, ঋতৃণ সবাই শামিল হয়েছেন এই সান্ধ্য বৈতালিকে। একটা অদ্ভুত সুন্দর পবিত্রতায় ভরে গিয়েছে গোটা শান্তিনিকেতন। এই জন্যেই তো এই সবার ছুটে আসা জ্যোৎস্নার স্নান করতে করতে এমনভাবেই শুরু হচ্ছে এবারের বসন্ত উৎসব। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এ রীতি। সত্যিই তো রবীন্দ্রসঙ্গীতই রাবীন্দ্রিক উৎসবে ঋকমন্ত্র। গানই তো উৎসবের প্রাণ। 'গানের ভিতর দিয়েই তিনি উৎসবের দ্বার খুলেছেন। ধ্যানেতে আর গানেতে আজি যামিনী যাক বয়ে'—এটা শুধু বসন্ত উৎসব নয়, যেন সব উৎসবেরই ভিতরের কথা।

কবির নির্দেশেই তো বৈতালিক। উৎসবের শুরু আর শেষে আশ্রমে বৈতালিক দল গান গেয়ে প্রদক্ষিণ করে বেড়াবে। এই বৈতালিকের গানই তো উৎসবের পরিবেশ তৈরি করবে। শুভশ্রী সাদা শাড়ি পড়ে এসেছে। বৈতালিকের দলে সে আছে। সাদা শাড়িতে তাকে মনে হচ্ছে যেন এক গোছা জুঁই ফুল। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল ঋতৃণ। শুভ্রতা চাঁদের আলো। সবার সাদা পোশাক, মাঝে মাঝে ফ্ল্যাশের ঝলকানিতে এগিয়ে যাচ্ছে বৈতালিকের দল। এতদিন বাদে সেখানে শামিল হয়েছেন লিনাও। শুভ্রতা আর পবিত্রতা যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে। ঋতৃণের পিছনে হাঁটতে হাঁটতে

দেখতে দেখতে সন্ধে নামল। লোকে লোকারণ্য গোটা শান্তিনিকেতন। গৌর প্রাঙ্গণে হাজির ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আশ্রমিকরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে সান্ধ্য বৈতালিক। ওরা সবাই সাদা পোশাকে হাজির।

বোকা ট্যুরিস্ট মানে বোটুদের কে যেন বলে বসল—সবার হাতে একটা করে মোমবাতি থাকলে দারুণ হত না? বোটুদের মধ্যেই কে একজন উত্তর দিল—ধুর মশাই। কী যে বলেন, এটা কি রিজানুরের মৃত্যুর প্রতিবাদমিছিল। মোমবাতির আলোয়ে চাঁদের আলোটা তো মার খেয়ে যেত। ঋতৃণ বুঝল এবার বোটুদের মধ্যে বড় বড় আঁতেলরাও আছেন। ওঁরা সবাই তখন গাইছে গাইতে ছাতিমতলায় ঢুকে পড়েছেন। বোটুদের এইসব কথাগুলো আরও একজনের কানে গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি হলেন অবিনাশ। সব শুনে তিনিও শিউরে উঠলেন। ছাতিমতলায় তখন আলোর বন্যা। গাছের পাতায় পাতায় আলো খেলা করছে। কোথাও বা গাছের প্রলম্বিত ছায়ায় বড্ড বেশি অন্ধকার। অবিনাশ দেখলেন আলোর নীচেই সবচেয়ে অন্ধকার। বোটুদের প্রগলভতা সত্ত্বেও গোটা শান্তিনিকেতন গান শুনছে। দোলের আগের দিনের সন্ধ্যার গান—

ও আমার চাঁদের আলো
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায়
ডালে ডালে।।
ও আমার চাঁদের আলো

বিদেশি মদ সহযোগে উৎকৃষ্ট খানা সবই আয়োজন করা হয়েছে। রয়েছে অতিথি বিনোদনের নানান ব্যবস্থা। আপাতত এক উঠতি টেলিভিশন অভিনেত্রীর বয়ফ্রেন্ড রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন।

আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছে। ধরা দিয়েছে যে আমার পাতায় পাতায়
ডালে ডালে।।

যে গান তোমার সুরে ধারায় বন্যা জাগায় তারায় তারায়
মোর আঙিনায় বাজল গো,
বাজল সে-সুর আমার প্রাণের
তালে তালে।।
ও আমার চাঁদের আলো

সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে
তোমার হাসির ইশারাতে
দখিন হাওয়ায় দিশাহারা
আমার ফুলের গন্ধে মাতে
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল
আমার প্রাণে
রঙের হিলোল—
আমার প্রাণে...
মর্মরিত মর্ম গো,
মর্ম আমার জড়ায়
তোমার হাসির জালে
ও আমার চাঁদের আলো
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ।

এদিকে প্রান্তিকের সঞ্জীবদার বাড়ির লনে পার্টি জমে উঠেছে। নিজের বড়লোকিপনা আর সাংস্কৃতিক বলয়ের লোকজনেদের সঙ্গে তার কতটা দহরম-মহরম বোঝাতে তিনি কোনও খামতি রাখেননি। মোহনা অগ্নি আর অরণিকে সবার সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছেন। এফএম চ্যানেলের জনপ্রিয় আর জে রাও যে তার কত পরিচিত সেটা জাহির করতে কম বাক্য খরচ করছেন না। ভিতরে ভিতরে অগ্নি যে খেপছে না তা নয়। চিরকালই এমন লোক দেখানো বড়লোকদের সে সহ্য করতে পারে না।

বিদেশি মদ সহযোগে উৎকৃষ্ট খানা সবই আয়োজন করা হয়েছে। রয়েছে অতিথি বিনোদনের নানান ব্যবস্থা। আপাতত এক উঠতি টেলিভিশন অভিনেত্রীর বয়ফ্রেন্ড রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন। প্রান্তিকের সব বড়লোক বাড়িতেই রবি ঠাকুরকে স্মরণ করে মোচ্ছব শুরু হয়। সঞ্জীবদার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না।

সারাদিন পায়ে হেঁটে দেবযানীর পা টনটন করছে। তাই সন্ধেবেলায় দেবযানী আর বেরয়ওনি। সেই সুযোগে অনর্ঘ্য হাজির তৃণার ঘরের সামনে। ডোর বেল দিয়ে অনর্ঘ্য ভাবল—একবারে তো তৃণা খুলবে না। এরপর সে কী করবে?

কিন্তু হল তার উল্ট। দরজা খুলে তৃণা দাঁড়াল। এমনভাবে যেন ঘরের দরজা সে আগলে রয়েছে। দেবযানী আর তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বার কতক সে তৃণাকে এসএমএস আর ফোন করেছে। লাভ হয়নি। এদিক থেকে কোনও জবাব আসেনি। সকালে দেখা হওয়া তৃণার সঙ্গে সন্ধেবেলার তৃণার যেন কোনও মিল নেই। অনর্ঘ্যর মনে হল তৃণার যেন মুখে একটা কাঠিন্যের প্রলেপ। তৃণাকে সে খুব আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে তৃণা।'

—আমারও তোমার সঙ্গে কথা আছে। তবে ঘরে না, অন্য কোথাও চলো। আসলে তৃণা আর কোনও সুযোগ দিতে চায় না অনর্ঘ্যকে।

অনর্ঘ্য আমতা আমতা করে বলল, 'কেন? ঘরে কথা বললেই তো ভালো হত। দুজনে নিভৃতে কথা বলতে পারতাম।' অনর্ঘ্যর কথা শুনে হঠাৎই তৃণার যেন মাথা গরম হয়ে গেল। 'দু'জনে নিভৃতে'— শব্দ দুটো শুনে রাগে তৃণা যেন রি-রি করে উঠল। মনে মনে সে ভাবল অনর্ঘ্য এত ন্যাকামি করে কথা বলতে পারে আগে তা তার জানা ছিল না। তৃণার মনে হল অনর্ঘ্য যেন একটা সরীসৃপ। কোথা থেকে আবার সে তার গায়ে উঠে পড়বে। ভাবতেই কেমন জানি একটা ঘা ঘিন ঘিন করে উঠল। না, সে অনর্ঘ্যকে কোনও সুযোগ দেবে না। আজই সে অনর্ঘ্যর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করে নেবে। আজ এখনই সে বলতে চায়, 'এই অনর্ঘ্য, আমার জীবন থেকে ফোটো তো। অনেক হয়েছে আর নয়।'

—চলো আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। কোথাও নিরিবিলিতে বসি।

—তুমি গাড়িতে যাও। আমি তৈরি হয়ে আসছি।—বলে

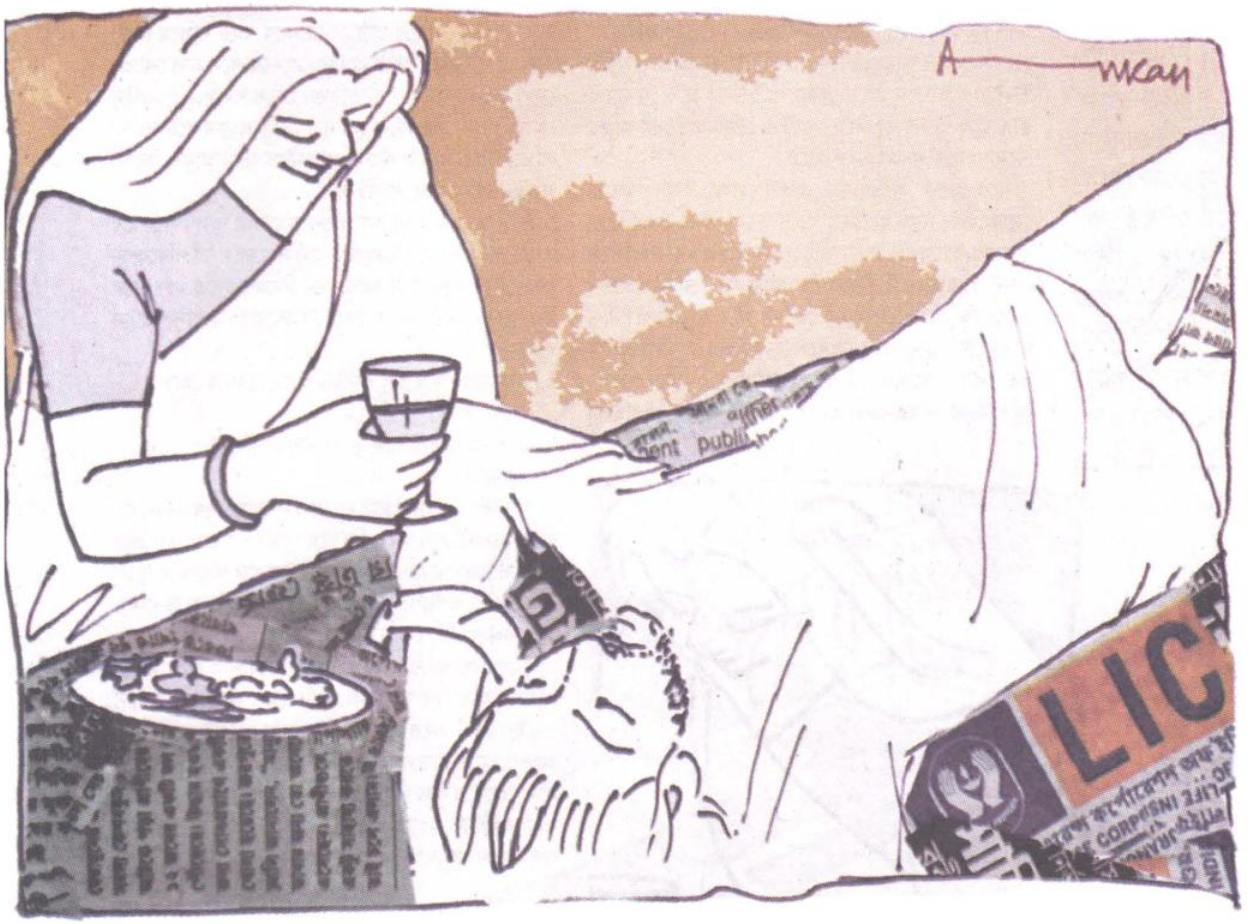

অনর্ঘ্যর মুখের সামনে দড়াম করে সে দরজা বন্ধ করে দিল।

অনর্ঘ্য বেরিয়ে এসে ওর গাড়িতে বসল। সে ভাবল যাই হোক কিছুটা হলেও চিঁড়ে কিছুটা ভিজেছে। গাড়িতে বসে বসে তার মনে হল আজ সন্ধেতে তৃণাকে একটু আদর করতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু তৃণার যা মুড। ঘরেই ঢুকতে দিল না। গাড়িতে বসেই অনর্ঘ্যর মালুম হল শান্তিনিকেতনে আজ যা ভিড়। কোথায় যাওয়া যায়? ইলাম বাজারের জঙ্গলের ওখানে 'লক্ষ্মীশায়ার'-এ নিশ্চয়ই এই ভিড়টা থাকবে না? 'ইনোভা' গাড়িতে আর কতক্ষণ লাগবে? সে রকম হলে তৃণাকে না হয় মানিয়ে গাড়ির ভিতরেই আধ-একটু আদর করা যাবে। ভাবতেই মনটা চনমনে হয়ে উঠল তার।

লিনা আর অবিনাশ রিকশাতে। লিনার মনটা একেবারে ভালো হয়ে গিয়েছে। কর্কট রোগের যন্ত্রণা, মাথার মধ্যে হরেক রকম চিন্তা, সবকিছুর বাইরে তিনি যেন এখন বিচরণ করছেন। বৈতালিকের পর হেঁটেই হোটেলে ফিরতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অবিনাশবাবু শুনলেন না। একটু রাগ দেখিয়েই বলেছেন—'আপনার এইসব রোমান্টিসিজম ছাড়ুন তো। অনেক হয়েছে। আপনাকে যে অবস্থায় দেখলাম তারপরও যে বৈতালিক দেখতে নিয়ে গিয়েছি এটাই অনেক।'—অবিনাশবাবু মনে মনে ভাবলেন হয়তো একটু বেশি রাগ দেখিয়ে ফেলেছেন তিনি। লিনার অবশ্য ভালোই লাগল। আজও এখানে এমন কেউ আছেন যিনি তাঁর ওপর রাগ দেখাতে পারেন। ফাগ সন্ধ্যায় এমন রাগের ভিতর অনুরাগের ছোঁয়া আবিষ্কার করলেন একজন। এখনও তাঁর কানে বাজছে

'ও আমার চাঁদের আলো,
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায়
ডালে ডালে।।...

অভিষিক্তা আর নীল বৈতালিকের শেষে কোনও সময় নষ্ট না করে শান্তিনিকেতন গেস্ট হাউসে হাজির। অদ্যই শেষ রজনী। তাই যেন অভিষিক্তার ঘরে ফেয়ারওয়েলের আয়োজন। খোয়াই-এ আজ সকালেই চায়ের দোকানে অভিষিক্তা নীলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ঘরের চাবি

নীল মানুষ হিসেবে বড্ড খাঁটি। ওয়াইনের গ্লাস নিয়ে সে জানলার সামনে দাঁড়াল। কাচের ওপারে দেখা যাচ্ছে দূরে আলোয় ঝলমল করছে গোটা এলাকা। যেন কলকাতার পুজো পুজো ভাব।

রিসেপশন থেকে নেওয়ার সময় গেস্ট হাউসের ম্যানেজার অবশ্য একটু তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। হয়তো মালিকের লোক বলে সে অভিষিক্তাকে বেশি ঘাঁটায়নি। তা ছাড়া বসন্ত উৎসবের আগের রাতে গোটা শান্তিনিকেতনে কে রাতে কার সঙ্গে থাকল তা নিয়ে হোটেল, গেস্ট হাউসের কারুর কি মাথা ব্যথা করার সময় আছে?

ঘরে ঢুকে অভিষিক্তা একটা হাল্কা হলুদ আলো জ্বেলেছিল। নরম আলোয় ঘরটা ভরে গেল। বৈতালিকে যাওয়ার আগে সে ঘরটা গুছিয়ে নিয়েছিল। রুম সার্ভিসে ফোন করে রেশমি কাবাব সহ স্ন্যাক্স আনিয়ে নিল ঘরে। এসবেরও অর্ডার সে আগে থেকেই দিয়ে রেখেছিল। নীল ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে ছিল। কিন্তু সেখানে তেমন যুত হল না দেখে ধপাস করে সে মেঝেতে বসে পড়ল। অভিষিক্তা ঘরের ফ্রিজ থেকে কিছু ফল বার করছিল।

নীলকে মেঝেতে বসতে দেখে সে হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। তার হাত টেনে ধরে প্রায় জোর করে খাটে বসিয়ে দিল। নীল হেসে বলল, 'আরে আমার মেঝেতে বসে মাল খেতেই বেশি ভালো লাগে।' অভিষিক্তা হেসে বলল, 'ওয়াইন খেতে হলে মেঝেটা চলে না। চেয়ারে কমফর্টেবল না লাগলে খাটে বসতে পারো। তার নীচে আমি আমার ফরাসি ওয়াইনকে নামাতে পারছি না।'

দুটো ওয়াইন গ্লাস আগে থেকেই বলা ছিল। সন্তর্পণে তাতে ওয়াইন ঢেলে চিজ আর ফল সহযোগে তা পরিবেশন করল সে। দুপুর বসে অভিষিক্তা নিজের হাতে মাপ করে চিজ আর ফলের টুকরো কেটে সাজিয়েছে। ফরাসি ওয়াইন বলে কথা।

—আমার কাছে শুধু ওয়াইন আছে। চলবে তো?

—দৌড়োবে।

বলে নীল একটি গ্লাস তুলে নিল।—চিয়ার্স

—চিয়ার্স।

অভিষিক্তা ওয়াইন গ্লাস নাড়াতে নাড়াতে দেখল নীল চোঁ করে গ্লাসটা শেষ করে দিয়েছে। তারপর সে আধশোয় অবস্থায় বিছানায় রাখা অভিষিক্তার ইংরেজি গীতাঞ্জলি তুলে নিল। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে রেশমি কাবাব তুলে কামড় দিয়ে বলল—বা, বেড়ে বানিয়েছে তো।

নীলের খাওয়ার ধরন দেখে অভিষিক্তার বেশ মজাই লাগল। অন্যসময় অন্য কেউ যদি এমন অমর্যাদায় ফরাসি ওয়াইন সেবন করে তাহলে সে হয়তো রেগেই যেত। কিন্তু আজ এখন তার মনে হল একটাই কথা—নীল নামক শিল্পীটি মানুষ হিসেবে বড্ড খাঁটি। ওয়াইনের গ্লাস নিয়ে সে জানলার সামনে দাঁড়াল। কাচের ওপারে দেখা যাচ্ছে দূরে আলোয় ঝলমল করছে গোটা এলাকা। যেন কলকাতার পুজো পুজো ভাব।

সে দিকে দেখতে দেখতে সে বলল, 'জানো আমার বহুদনের ইচ্ছে শান্তিনিকেতনে আসার। কলেজ লাইফেও ট্রাই করেছিলাম। হয়ে ওঠেনি।'

নীল রেশমি কাবাব খেতে খেতে বলল, 'বেটার লেট দ্যান নেভার। অভিষিক্তা জানলা দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছে। তার মনে গেল পড়ে ফেলে আসা দিনগুলো।—জানো কলেজে আমরা দোলের আগের দিনটা খুব মজা করতাম। রং মেখে পুরো সং সেজে বাড়ি ফিরতাম। মা, চিনতেই পারত না।

—অদ্ভুত না! রং-এ চেনা মানুষও কেমন অচেনা হয়ে যায়।

—তোমার গ্লাসটা ফাঁকা। আরেকটা দিই?

—তুমি কি সব সময় ওয়াইনই খাও?

—না সেরকম নয়। খেলে ওয়াইনটাই বেশি ভালো লাগে। তোমার ভালো লাগছে না?

—দারুণ লাগছে।... জানো, আমরা বন্ধুবান্ধবরা মিলে কোপাই-এর ধারে বসন্ত উৎসবের আগের দিন মানে আজকে সারা রাত চুটিয়ে মহুয়া খেতাম।

—এবার কি আমার জন্য ক্যানসেল হয়ে গেল?

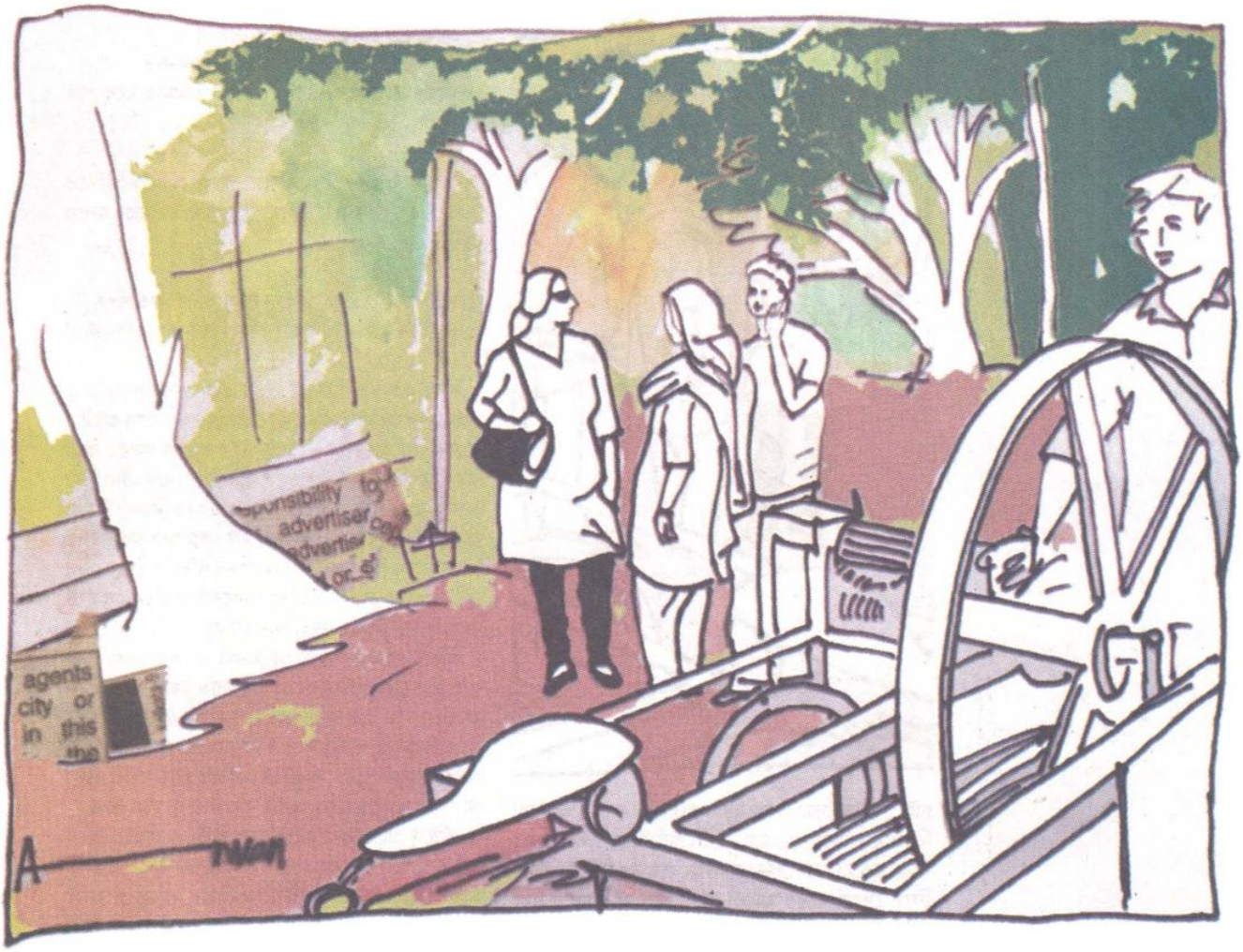

নীল একটু হেসে বলল, সেই গ্রুপটাই আর নেই। বন্ধুরা এক এক করে বিভিন্ন জায়গায় চলে গেল। চেষ্টা করেছিলাম। সবাইকে ফোন করে... যদি এই একটা দিনের জন্য আসতে পারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর হল না।

—কেন?

নীল একটা সিগারেট ধরাল। ইন করে নাক দিয়ে ধোঁয়া বার করে মুখে একটা তাচ্ছিল্য এনে বলল— 'কারণ সবাই নাকি দারুণ ব্যস্ত।'

—ইচ্ছে করে এখনও না? সবাই মিলে আগের মতন বসন্ত উৎসবে মেতে উঠতে?

—খুব উ উ উ উ...

—জানো তো, মাঝে মাঝে ইচ্ছের পায়ে বেড়ি পরাতে হয়!

—অগত্যা। আসলে কী জানো...

'ইচ্ছে হল এক ধরনের গঙ্গা ফড়িং
অনিচ্ছাতেও লাফায় খালি তিড়িং বিড়িং'

বলে চোঁ চোঁ করে এক ঢোকে গ্লাসের ওয়াইনটা শেষ করে অভিষিক্তার গ্লাসের দিকে তাকিয়ে সে বলল— 'কী হল, তোমারটা এবার শেষ করো। না হলে তো আমি আর নিতেই পারব না।

—না, না, কেন পারবে না। বলে অভিষিক্তা বোতল নিয়ে এসে ওর ওয়াইন গ্লাসটা ভরে দিল।

পেশাগত কারণে অভিষিক্তা কখনওই ড্রিঙ্কসের মাত্রা ছাড়ায় না। তা ছাড়া মাত্রারিক্ত সেবন ওর বরাবরই আতঙ্ক। নীল যে হারে ওয়াইন গিলছে তাতে প্রমাদ গুনল অভিষিক্তা। এদিকে গোটা ঘরে নীলের সিগেরেটের ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। নীলই বলল, ঘরে এসি বন্ধ করে জানলা খুলে দিতে। জানলা খুলতেই অভিষিক্তা বুঝল বাইরে গোটা পৃথিবী চাঁদের আলোয় ভাসছে। এত সুন্দর লাগছে বাইরেটা। জানলার গ্রিল আঁকড়ে অভিষিক্তা দাঁড়িয়ে চাঁদটাকে দেখতে

চাইছে। কিন্তু দোলের চাঁদ দুষ্টুমি করে যেন গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছে... হঠাৎ অভিষিক্তা দেখল ওদের ঘরের আলো নিবে গেল। জানলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে পিছনে ফিরে দেখল ঘরের আলো-আঁধারিতে গ্লাস হাতে নীল দাঁড়িয়ে।— 'সরি! ঘরের মালকিনের বিনা অনুমতিতে আলো নিবিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় এমন সন্ধ্যায় চাঁদের আলোকে তাচ্ছিল্য করাটা আরও ভয়ানক অপরাধ।' অভিষিক্তা হাসল। মনে মনে সে ভাবল নীলের বোধহয় নেশা ধরছে। নীল বলল, 'একটা গান গাওয়া যাক।'—অভিষিক্তা বলল, 'উত্তম প্রস্তাব।'

—এটা এখন আমাদের এখানের সবচেয়ে হিট গান। বিশেষ করে মোহনদার ছেলে বিক্রম সিং খান্দুরা আর অর্ণব গাওয়ার পর। অথচ দু'জনের গায়কী একেবারে আলাদা...' বলে হঠাৎ নীল চুপ মেরে গেল।

—কী হল?

—না, ভাবছি মাল খেয়ে বেশি জ্ঞান দিচ্ছি নাকি?

—না, না, গানটা শুরু করো।

—নীল ধরল—ওয়াইনের স্রোতে ওর গলা একটু ভাঙা ভাঙা লাগছে

'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না।
মোহমেঘে তোমারে দেখিতে দেয় না
অন্ধ করে রাখে, তোমারে দেখিতে দেয় না।
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে

কী করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে
ওহে এত প্রেম আমি কোথা পাব, নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে...

আর-কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে প্রাণপণ—
ওহে তুমি যদি বলো এখনি করিব বিষয়-বাসনা বিসর্জন।'

সন্ধে যত গাঢ় হয়েছে ততই যেন পাল্লা দিয়ে ভিড় বেড়ছে। শান্তিনিকেতনে যেন নেমেছে কলকাতার অষ্টমীর রাতের জনস্রোতের ঢল। গাড়ি নিয়ে অনেক কসরত করে অনর্ঘ্য তৃণাকে নিয়ে এসেছে লক্ষ্মীশায়রে। এদিকটায় ভিড় অনেক কম। লক্ষ্মীশায়র তো এখন একদম নির্জন। চাঁদের আলোয় ভাসছে ঢেউ খেলানো মাঠ। শায়রের জল চাঁদের আলোয় চিক চিক করছে। এমন সুন্দর পরিবেশ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল তৃণার। সব ভুলে কিশোরীর মতন সে ছুটে গেল জলের দিকে... জলে এত আলো!

আসার পথে নির্জন রাস্তায় অনর্ঘ্য একবার অবশ্য চেষ্টা করে ছিল তৃণার ঘনিষ্ঠ হতে। কিন্তু লাভ হয়নি। তৃণা এমন হিংস্রভাবে তাকিয়ে অনর্ঘ্যকে শাসিয়েছে। বলেছে দরকারে সে নাকি চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ মারবে। তারপর অবশ্য অনর্ঘ্য আবার সুবোধ বালকের মতোই গাড়ি চালিয়েছে। আজকাল তৃণাকে মাঝে মধ্যেই বড্ড অচেনা মনে হচ্ছে।

এদিকে প্রান্তিকের বাংলোতে পার্টি একেবারে জমে উঠেছে। বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত 'আরবান' অথচ 'এথনিক আপমার্কেট ক্রাউড' স্কচ-ওয়াইন-বিয়ার সহযোগে বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপনে ব্যস্ত। উপস্থিত প্রায় বেশিরভাগ মহিলারাই নিজেদের গঠন-প্রকৃতির সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে দুঃসাহসী সব পোশাকে নিজের শরীরকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সুস্মিতা সহ দু-একজন অবশ্য এর ব্যতিক্রম। আর মোহনা। এই সুন্দর সন্ধ্যা-রাতের সন্ধিক্ষণে গোটা পার্টির যেন মক্ষিরানি। বাটিক প্রিন্টের শাড়ি, কাঠের সুচারু অলঙ্কারে সুসজ্জিতা সেই যেন সব পুরুষের নজরে। পুরুষের প্রলুব্ধ দৃষ্টির সুতীক্ষ্ণ চাউনিতে মোহনা যেন আরও ঝলসে উঠেছে।

খাব না বলতে বলতে অগ্নি ইতিমধ্যেই তিন পেগ 'ব্ল্যাক ডগ' মেরে দিয়েছে। 'কালো কুকুর' পানের ফলে দেহের রক্ত সঞ্চালনের দ্রুততার সঙ্গে সঙ্গে তার বোধবুদ্ধিও ধীরে ধীরে প্রখর হয়ে উঠছে।— অন্তত অগ্নির এমনটাই মনে হচ্ছে। ফলে সে ধীরে ধীরে অতি-সংবেদনশীল হয়ে উঠছে। অরণি-মোহনা-সুস্মিতা-সুস্মিত আর সে প্রথম দিকে একসঙ্গেই বসেছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে বাউল সঙ্গীতে যখন জলসা মোড় নিল তখন সুস্মিতা আর সুস্মিতকে

A unit of
Rose Valley™
Happiness Unlimited

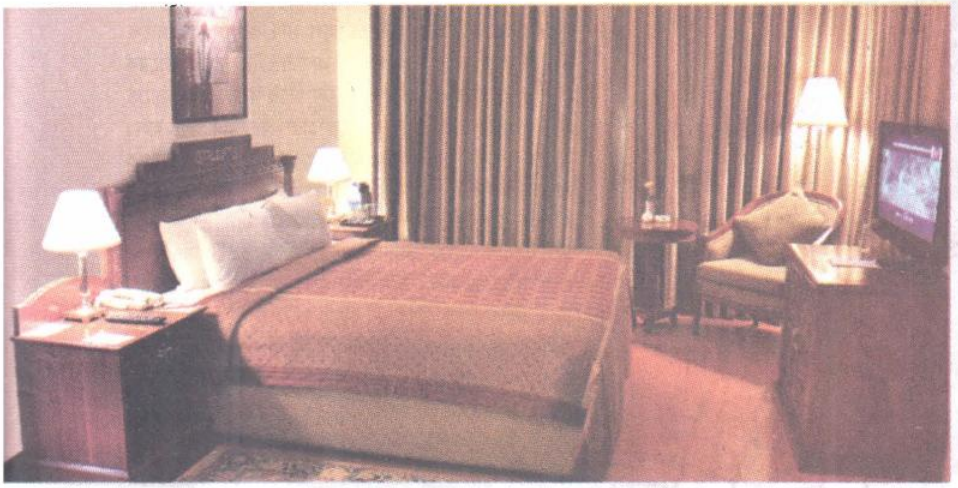

BE PROUD OF EVERY MOMENT YOU STAY!

Tripadvisor awards the Certificate of Excellence to Hotel Park Prime, Jaipur

Hotel Park Prime is the ultimate destination for your business or leisure travel in Jaipur. Located at the heart of the city, on Prithviraj Road, it delights you with world-class services and makes your stay one of the most memorable ones.

• High speed internet connectivity • Satellite television service • Mini bar in rooms • In-room electronic safe • Oasis, the multi-cuisine restaurant • The Terrace Grill, the rooftop barbeque • Henry's, the pub • 24-hour business services • Rooftop outdoor pool • Banquet hall • Boardroom • Health club

For Bookings, Call: +91 141 2360202/ 90070 22890/ 91633 99988/ 98316 99888

meganminds.in

Hotel Park Prime, Jaipur is grateful to all its valued guests who've made it achieve this laurel.

Park Prime
JAIPUR

C-59, Prithviraj Road, C-Scheme, Jaipur-01
www.parkprime.net

একটা সময়ে আধঘুমে তার মনে হল সত্যি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে আবার প্রবলভাবে ফিরে এসেছেন। হোটেলের কামরায় শুয়েও তাঁর মনে হল তিনি যেন বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছেন... কিছুক্ষণ বাদেই মা মশারি তুলে দেখবেন সে ঘুমিয়েছে কি না।

সঞ্জীবদার স্ত্রী সোনালিদি ডেকে নিল। গৃহকর্তার বোন হিসেবে তার কত কাজ। এক পূর্বপরিচিত ভদ্রলোকের ধূমপান আমন্ত্রণ রক্ষার্থে জনতার ভিড় থেকে একটু দূরে যেতে হয়েছিল তাকে। ফিরে এসে সে দেখল অরণি এক স্বঘোষিত পুরাতত্ত্ববিদের সঙ্গে আড্ডায় মশগুল। আর মোহনা পিআর করতে ব্যস্ত। অগ্নির মোহনার এই গায়ে পড়ে জনসংযোগ করাটা অসহ্য লাগে। এই সময়টা মোহনাকে যেন তার মনে হয় একটু বেশিমাত্রায় গায়ে পড়া। আসলে গোটা পার্টি জুড়েই কলকাতার লোকজন। সবার সঙ্গে সবার চেনাশোনা সবই সবাইকে চেনে। তবু এরই মধ্যে চলছে মুখ শোঁকাশুঁকি। এর পিছনে কারুর কারুর ধান্দাবাজিও চলছে। চলছে মহিলাদের ফ্লার্ট করা। ওই মিলন ঋতুতে পাড়ার মাদি কুত্তাকে ঘিরে যেমন চলে আর কী। ফাঁক-তালে যদি পাওয়া যায়। চতুর্থ পেগ শেষ করার মুখে অগ্নির এমনই মনে হতে লাগল। গোটা পার্টিটা হঠাৎই তার মনে হল অত্যন্ত অশ্লীল জায়গা। এরই মধ্যে দেখল এক আধবুড়ো ফিল্ম ডিরেক্টর মোহনাকে কী সব যেন বোঝাচ্ছে। আর মোহনাও সিরিয়াস মুখ করে শুনছে।

পঞ্চম পেগের প্রথম চুমুক দিতে গিয়েই অগ্নির সামনাসামনি পড়ে গেল এক সাংবাদিক। অগ্নির সঙ্গে কোনওকালেই তার হৃদ্যতা ছিল না। কলকাতায় মাঝে মাঝেই তার সঙ্গে দেখা হয়। দু-একটা সৌজন্য বিনিময়ের বেশি কথাও হয় না। হঠাৎ সে যেন গায়ে পড়ে ভাব জমাতে এল অগ্নির সঙ্গে। কিছুক্ষণ বাদে তারণ কারণটা স্পষ্ট হল। অগ্নির এক দাদা স্থানীয় রাজনীতিবিদের সঙ্গে সখ্যতা গড়তে সাংবাদিক মশাই বিশেষ আগ্রহী। লক্ষ্য নিউটাউনের একটা প্লট যদি রাজনীতিবিদের দাক্ষিণ্যে পাওয়া যায়। ঋতৃণ মনে মনে ভাবল—মুখে তিনি গণতন্ত্রের অতন্দ্রপ্রহরী আর তলে তলে সস্তা দালালি। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অগ্নির চোখ চলে গেল মোহনার দিকে। ফিল্ম মেকার এখনও মোহনাকে কী বলে যাচ্ছে। অগ্নির এবার অসহ্য লাগছে। আধবুড়ো ভামের যেমন কচি খরগোশ দেখলে জিব লক লক করে এইসব যৌবন যাব যাব বুড়োরাও সুন্দরী মহিলা দেখলে নিজেদের ঠিক রাখতে পারে না। এইসব পক্কেশীরা অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে শিকারকে কাছে নিয়ে আসে। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মারে। মোহনা বোকার মতন এই লোকটার কথা কী এত শুনছে? অগ্নির মনে হল এক্ষুনি মোহনাকে নিয়ে সে এই পার্টি ছেড়ে চলে যাবে।

গোটা শান্তি নিকেতন যখন জমজমাট তখন বড্ড তাড়াতাড়ি লিনা শুয়ে পড়েছেন। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে। অবিনাশকে তিনি বলেছেন বৈতালিক, শোভাযাত্রা, সঙ্গীতানুষ্ঠান সব দেখে তিনি আবির মাখবেন। কালকের দিনটায় কোনও বাধাই তিনি মানবনে না। কতদিন বাদে রং মাখবেন... ভাবতেই মনের ভিতর পুলক জাগছে তাঁর।

তাঁর ঘরের আলো নেবানো। কাচের জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ছে ঘরের ভিতরে। বহুদিন পর একটা গান তাঁর মনে পড়ছে—

'নিবিড় অমা, তিমির হতে
বাহির হল জোয়ার স্রোতে
শুক্ল রাতে চাঁদের তরণী...'

একটা সময়ে আধঘুমে তার মনে হল সত্যি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে আবার প্রবলভাবে ফিরে এসেছেন। হোটেলের কামরায় শুয়েও তাঁর মনে হল তিনি যেন বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছেন... কিছুক্ষণ বাদেই মা মশারি তুলে দেখবেন সে ঘুমিয়েছে কি না। মার কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার পর সস্নেহে মা ফিসফিসিয়ে বলবেন—এখনও ঘুমাসনি খুকু... কাল সকালে ঘণ্টাঘরের সামনে মাধবীলতা যে তোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে...

... ওরে কাল যে আমাদের বসন্ত উৎসব... তোকে যে স্নান করে সকালে বাসন্তী রঙের শাড়ি পরতে হবে...। খুকু আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে ঘুমের রাজ্যে... বড় মায়াময় সে রাজ্য। ❖

চলবে

অলঙ্করণ : অঙ্কন বন্দ্যোপাধ্যায়

ডেথ মেটাল

মলয় রায়চৌধুরী

মুখপুড়ি অবন্তিকা, চুমু খেয়ে টিশু দিয়ে ঠোঁট পুঁছে নিলি?

শ্বাসে ভ্যাপসা চোখের তলায় যুদ্ধ চিহ্ন এঁকে ডেথ-মেটাল মাথা দোলাচ্ছিস
চামড়া জ্যাকেট উপচে লালনীল থঙ গলায় পেতল-বোতাম চোকার
ঝাপটাচ্ছিস সেকুইন গ্ল্যাম রকার খোলা-চুল কোমরে বুলেট বেল্ট
বেশ বুঝতে পারছি তোকে গান ভর করেছে যেন লুঠের খেলা
স্ক্রিমিং আর চেঁচানি-গান তোর কার জন্য কিলিউ কিলিউ কিল
ইউ, লাভিউ লাভিউ লাভ ইউ, কাঁসার ব্যাজপিন কব্জিবেল্ট
কুঁচকিতে হাত চাপড়ে আগুনের মধুর কথা বলছিস বারবার
আমি তো বোলতি-বন্ধ থ, তুই কি কালচে ত্বকের সেই বাঙালি মেয়েটা?
কোথায় লুকোলি হ্যাঁরে কৈশোরের ভিজেচুল রবীন্দ্রনাথের স্বরলিপি
কবে থেকে নব্বুই নাকি শূন্য দশকে ঘটল তোর এই পালটিরূপ!
পাইরেট বুট-পা দু'দিকে রেখে ঝাবড়াচুলে হেড ব্যাং হেড ব্যাং হেড ব্যাং
ঝাঁকাচ্ছিস রঙিন পাথরমালা বুকের খাঁজেতে কাঁকড়া এঁকে
পাগলের অদৃশ্য মুকুট পরে দানব-ব্লেড বেজ গিটারে গাইছিস
বোলাও যেখানে চাই নেশা দাও প্রেম-জন্তুকে অ্যানথ্র্যাক্স বিষে
মেরে ফ্যালো মেরে ফ্যালো মেরে ফ্যালো কিল হিম কিল হিম কিল
কিন্তু কাকে বলছিস তুই বাহুতে করোটি উলকি : আমাকে?
নাকি আমাদের সবাইকে যারা তোকে লাই দিয়ে ঝড়েতে তুলেছে?
যে আলো দুঃস্বপ্নের আনন্দ ভেঙে জলের ফোঁটাকে চেরে
জাপটে ধরছিস তার ধাতব বুকের তাপ মাইকে নিংড়ে তুলে
ড্রামবিটে লুকোনো আগুনে শীতে পুড়ছিস পোড়াচ্ছিস
দেয়াল-পাঁজিতে লিখে গিয়েছিলি ফেরারি জারজ-লোক .
ভাঙাচোরা ফাটা বাক্যে লালা-শ্বাস ভাষার ভেতরে দীপ্ত
নিজেরই লেখা গানে মার্টিনা অ্যাসটর নাকি 'চরমশত্রু' দলে
অ্যানজেলা গস কিংবা 'নাইটউইশ'-এর টারজা টুরম্যান
লিটা ফোর্ড, মরগ্যান ল্যানডার, অ্যামি লি'র বাঙালি বিচ্ছু তুই
লাল নীল বেগুনি লেজার-আলো ঘুরে ঘুরে বলেই চলেছে
তোরই প্রেমিককে কিল হিম লাভ হিম কিল হিম লাভ হিম লাভ
হিম আর ঝাঁকাচ্ছিস ঝাবড়া বাদামি-চুল দোলাচ্ছিস উন্মত্ত দু'হাত...

অলঙ্করণ : দেবযানী

মানুষে টানা রিকশা

ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে আঠারোশো আশি সালে সিমলায় প্রথম মানুষ টানা রিকশা চলতে শুরু করে। তারও প্রায় বিশ বছর পর কলকাতায় আসে রিকশা। সাহেবরা চিনের সাংহাই থেকে এই রিকশা আমদানি করে আনে।

বর্ষা এসে গেল। গতকাল থেকে অবিশ্রান্ত, বৃষ্টিপাতের ধারা আজ সকালেও অব্যাহত। আমি বসে আছি মধ্য কলকাতায় এক বন্ধুর তিনতলা বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায়। মাথার মধ্যে একরাশ শূন্যতা নিয়ে ভেবে চলেছি উদাসীবাবার আখড়ায় এবার কোন গল্প কথা শোনানো যায়। ঠিক এই সময় নিচের বাইলেন দিয়ে টুংটাং ঘন্টি মেরে চলে যায় একটা টানা রিকশা । সঙ্গে সঙ্গে ভাবনায় উঁকি মারে রিকশা নিয়ে বিশেষ করে এই মানুষে টানা রিকশা নিয়ে আসার এক সময়ের চিন্তা-ভাবনার কথা। এদের নিয়ে আসার প্রশ্নের সূত্রপাত হয়েছিল অপর্ণা সেন নির্মিত 'পারমিতার একদিন' ছবির শুটিং-এর সময়। একটি দৃশ্য ছিল পারমিতা (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) তার শাশুড়ি (অর্পণা সেন) কে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় টানা রিকশা করে যাচ্ছে। আমি এই ছবির সহকারী ও অন্যতম চিত্রগ্রাহক হিসেবে থাকার ফলে শুটিং-এর নানাবিধ ব্যবস্থা করতে হচ্ছিল সেই সময়। রিকশা রাস্তার কোন দিক দিয়ে যাবে, কতটা জোরে যাবে, রিকশা চালাক কখন কখন তার হাতের ঘন্টা নাড়াবে বা বাজাবে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ইত্যাদি প্রভৃতি। এই সব ব্যবস্থাদি করতে গিয়ে রিকশাচালক সুখদেবের সঙ্গে আমার খুব জমে গেল। সেটা ছিল দুহাজার সালের কথা সম্ভবত। তখন টানা রিকশা তুলে দেওয়ার জন্য নানা বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে। সুখদেবের জীবনের নিরাপত্তাহীনতার কথা আমি সেই শুটিং-এর মাঝে মাঝে শুনে যাই। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র ঋতুপণা আমাকে ঠাট্টা করে রিকশাওয়ালার সাথে কথা বলতে দেখে। বলে, 'রিকশাওয়ালাকেও বন্ধু করে নিয়েছো?' আমি কোনও উত্তর দিইনা।

বাগবাজারে ছিল আমার মামার বাড়ি। গ্রীষ্মকালের ছুটি কাটাতে প্রায় প্রতিবছরই যেতাম সেখানে। গেলেই আমার দায়িত্ব পড়ত দিদাকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাওয়া। বয়স্ক বিধবা তায় ব্রাহ্মণ। ছোঁয়াছানি যাতে। না লাগে তাই টানা রিকশায় চেপেই যেতাম। সেটাই ছিল যা অদ্যাবধি টানা রিকশা চড়ার অভিজ্ঞতা। জ্ঞানগম্যি খানিক হওয়ার পর মানুষে টানা রিকশায় কোনও দিন চাপিনি। অমানবিক বলেই নয়, একজন মানুষ পেটের দায়ে ঘাম ঝরিয়ে দৌড় লাগাবে আর আমি নিশ্চিন্তে আরামে বসে থাকব গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য এতে আমার সায় ছিল না। হ্যাঁ অমানবিকই তো! আটের দশকের মাঝামাঝি এই টানা রিকশা নিয়ে চিত্রগ্রাহক শশী আনন্দ একটা ছোট ছবি করেছিল অস্বীকার করবো না যে সেই ছবি আমাকে রিকশাচালকদের সম্পর্কে জানতে উৎসাহী করে তুলেছিল। এদের দৈনন্দিতায় আর্থিক চাপ আমাকে চিন্তিত করেছিল। আবার এটাও ভাবিয়ে ছিল যে সারা পৃথিবী থেকে এই পেশা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেলেও আমার শহরে আছে। এই পেশার লোকেরা ভাল-মন্দ মিশিয়ে দেয় অনেকে পরিবর্তে নেয় যৎ সামান্য। তারপর আর পাঁচটা বাঙালির মতো আমার নিকট স্মৃতি লোপাট হয়েছে।

২০০৫ সালে আবার রিকশা চালকদের নিয়ে ভাবনাটা উসকে দেয়, যখন তৎকালীন বামপ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে টানা রিকশা তুলে দেবে কলকাতা থেকে। আজও তা তোলা যায়নি। কেননা এতগুলো মানুষকে কর্মচ্যুত করার দায় সরকার নিতে পারে না। সেই সময় বিরোধী দলের নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিধানসভায় রিকশাচালকদের হয়ে জোর সওয়াল করেছিলেন। আমরা কেউ কেউ বিচ্ছিন্নভাবে এর বিরুদ্ধে বলি। সেটা বড় কথা নয়। তবে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিতর্ক চলতেই থাকে যে টানা রিকশা কতটা অকৃত্রিম

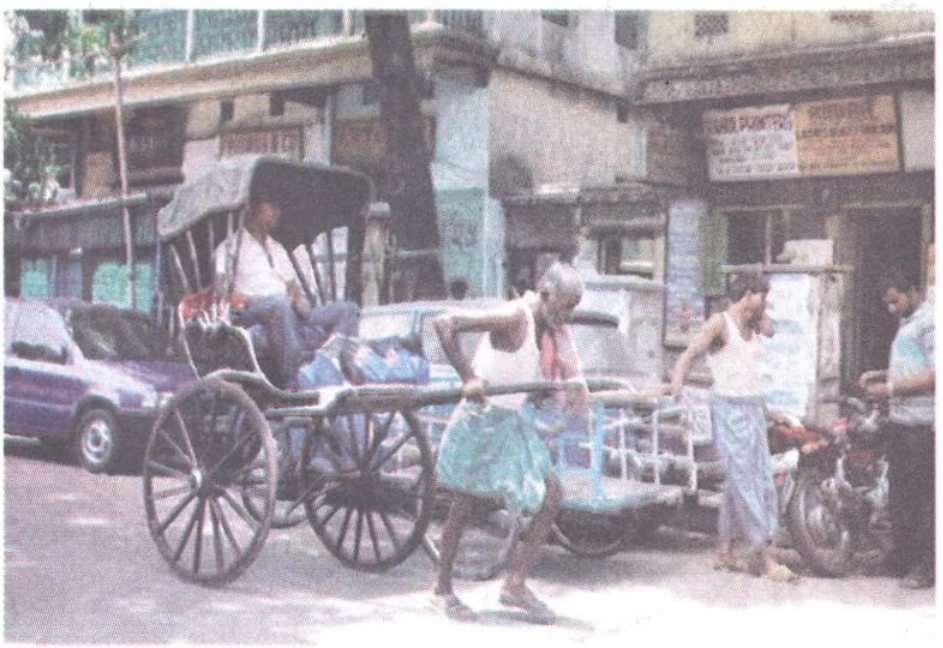

আটের দশকের মাঝামাঝি এই টানা রিকশা নিয়ে চিত্রগ্রাহক শশী আনন্দ একটা ছোট ছবি করেছিল সেই ছবি আমাকে রিকশাচালকদের সম্পর্কে জানতে উৎসাহী করে তুলেছিল।

পরিবেশ বন্ধু যান ও তার ঐতিহ্যই বা কী। ঐতিহ্য তো বটেই। হতে পারে 'ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য' কিন্তু ঐতিহ্য বলে স্বীকার করতেই হবে। আর পরিবেশ বন্ধু বা সামাজিক দায়িত্বের কথা উটলে আরও সাতপাঁচ কথা আসবেই। আসলে এই লেখার শুরুতেই রিকশা দেখে মনে হচ্ছিল বর্ষকালে এদের অপার প্রয়োজনীতার কথা। জল জমা এই পুরোনো শহর কলকাতার অলিতে গলিতে এই রিকশা কত কত রোগীর জীবন বাঁচাচ্ছে। যেখানে রিকশা ছাড়া চলার অন্য কোনও উপায় নেই। এই রিকশাই হয়তো দেখা যাবে কত শত ছাত্র-ছাত্রীকে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিচ্ছে। কলকাতায় এমন সব এলাকা আছে যেখানে বর্ষাকালে চলাফেরা করার জন্য একমাত্র ভরসা রিকশা। অফিস যাত্রী থেকে ছোট ব্যবসাদারের মালবহনের জন্য এই রিকশা এখনও অন্যতম অপরিহার্য যান হিসেবে এই শহর কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গরীব গুরবো এই মানুষগুলোকে হঠাৎ ছেঁটে ফেললে চলবে? না তা করা সম্ভব! এবার পাঠকের জ্ঞাতার্থে ঐতিহ্যবাহী এই মানুষে টানা যান সম্পর্কে দু'চার কথা লেখা যাক। এখন পর্যন্ত জানা গেছে যে জোনাথন নামে এক ইউরোপীয়ান পাদ্রী আঠারোশো উনসত্তর সালে টানা রিকশার একটা নক্সা তৈরি করেন। যদিও তা ছিল মূলত মাল পরিবহনের জন্য। এই দু'চাকার মানুষচালিত রিকশা যানের প্রথম ব্যবহার শুরু হয় আটারোশো চুয়াত্তর সাল নাগাদ জাপানে। সেখানে এর একটা নামও দেওয়া হয়। সেই নামটি হল 'জিন-রিকি-শা'। জাপানী ভাষায় যার অর্থ হল 'মানুষে টানা যান'। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বড় বড় শহরগুলিতে পরবর্তীকালে টানা রিকশা চলতে শুরু করে। আফ্রিকাতেও কোনও কোনও শহরে এর চল ছিল। কালান্তরে নানা মানবিক প্রশ্নের উত্থাপনে মানুষে টানা রিকশা উঠে যায় সারা পৃথিবী থেকে। ব্যতিক্রম শুধু আমাদের এই শহর কলকাতা। চিনে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসার পর পরই টানা রিকশা নিষিদ্ধ করা হয়।

ভারতবর্ষে আঠারোশো আশি সালে সিমলায় প্রথম মানুষ টানা রিকশা চলতে শুরু করে। তারও প্রায় বিশ বছর পর কলকাতায় আসে রিকশা। সাহেবরা চিনের সাংহাই থেকে এই রিকশা আমদানি করে আনে। প্রাথমিকভাবে কলকাতার চৈনিক ব্যবসাদারেরা মাল পরিবহনের কারণেই এর ব্যবহার শুরু করে। রিকশা চালকদের আবেদন মোতাবেক উনিশশো উনিশ সালে হ্যাকনি ক্যারেজ আইন প্রণয়নের সুবাদে এই মালবাহী টানা রিকশা যাত্রীবাহী টানা রিকশায় রূপান্তরিত হয়। প্রায় একশো বছরের ওপর এই কলকাতা শহরে রিকশা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজারের মতো। পুলিশের হিসাবে যার অর্ধেকের বেশি রিকশার লাইসেন্সই নেই। তবু চলছে। চলছে তার কারণ আগেই বলেছি যে এর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না। যতই তা অমানবিক হোক বা সারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, সারা পৃথিবীতেই ভূমিহীন কৃষকের শহরে আসার পর দেখা গিয়েছে তাদের প্রথম কর্মসংস্থানই হল রিকশা চালানো। অন্তত সেই সব শহরে যেখানে রিকশার চল ছিল। কথাটা কলকাতা শহরের ক্ষেত্রেও অনেকটাই সত্য। আরও বড় সত্য হল কলকাতার সিংহভাগ রিকশা চালকই বিহার-ঝাড়খণ্ড-উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত এবং তারাও মূলত ভূমিহীন কৃষক। একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে কলকাতা শহরের নব্বই শতাংশ রিকশা চালকের কোনও ঠিকানা নেই। যার মধ্যে চুয়ান্ন শতাংশই। রাত কাটায় যেখানে সে রিকশা রাখে বা নেহাতই রিকশার ওপর। আর বাদবাকি উনচল্লিশ

প্রায় একশো বছরের ওপর এই কলকাতা শহরে রিকশা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজারের মতো। পুলিশের হিসাবে যার অর্ধেকের বেশি রিকশার লাইসেন্সই নেই। তবু চলছে। চলছে তার কারণ আগেই বলেছি যে এর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

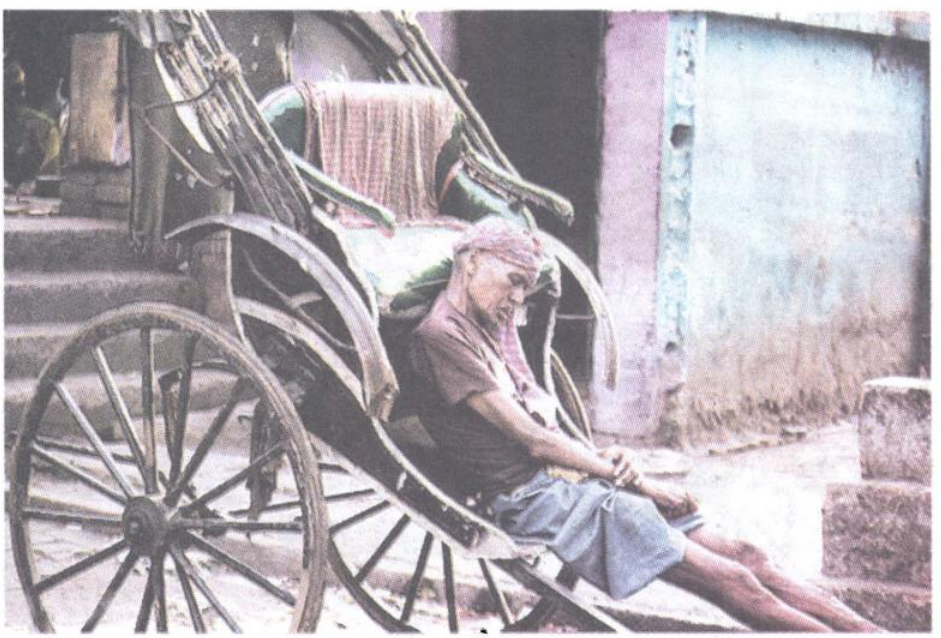

শতাংশ হল ফুটপাতবাসী। দিনে এদের পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা রোজগার। বর্ষাকালে কিছুটা বাড়ে। তবে অধিকাংশেরই নিজের রিকশা নেই। মালিকের রিকশা জমাতে নিয়ে খাটে।

এখানেই শেষ নয়। এই রিকশা চালকদের মধ্যে প্রায় ষাট শতাংশের মধ্যে যক্ষ্মার সংক্রামন দেখা গেছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে দিস্তে ছাতু ছাড়া এদের কিছু জোটে না। এদের মধ্যে একটা বিরাট অংশের নানারকমের শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগ আছে। কিন্তু চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। রিকশা চালকদের ইউনিয়ন আছে। যে ইউনিয়নের এককালীন নেতা জর্জ ফারনান্ডেজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত বড় ইউনিয়নের আপনি নেতা, প্লেনে করে যাতায়াত করেন। এদের একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় না, এদের একটু যাতে রোজগার বেশি হয় সে দিকে নজর দেওয়া যায় না? নেতাজি বললেন, 'দেখ ও গ্রামে থাকলেও এটাই এর ভবিতব্য হত। এখানে শহরে কম হলেও দু'চার আনা রোজগার করছে। আমার লক্ষ্য হল রিকশা বন্ধ করা যাবে না। বাদবাকিটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হবে।' বুঝলাম রিকশঅ উঠলে নেতাজির নেতা থাকা হবে না। কিন্তু এতগুলো মানুষের দায়দায়িত্ব উনি নিতে চান না। শুধু গরম-গরম ভাষণ দিয়ে আখের গোছানোই উদ্দেশ্য। আজ যারা নেতা তারাও উত্তরাধিকার সূত্রে একই কথা বলবেন বলে আমার বিশ্বাস। একশো বছরের ওপর এই শহরের রিকশার খোঁজখবর নিতে গিয়ে জেনেছি যে বাবুয়ানার সঙ্গে রিকশার একটা প্রবল যোগ ছিল একটা সময়। কলকাতার বাবুরা মদ্যপান করে বাইজি বাড়ি থেকে ফেরার সময় এই রিকশা চড়ে ফিরতেন। নামার সময় রিকশা চালককে পকেট উজাড় করে টাকা-পয়সা দিতেন। আজ আর সেই দিন নেই। এখন রাস্তার মোড়ে মোড়ে আছে অটোরিকশা। মাতালরাও আজ আর কিরশা চড়া বাবু নয়। শুনেছি রিকশা চড়াটা এক সময় ফ্যাসান ছিল। এমন গন্ধও শোনা যায় যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর লোক দিয়ে টানা রিকশা বানিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ছাদে কিরশায় চেপে ঘুরেছেন। আমার বাবা-কাকাদের কাছে শুনেছি সাহেবদের একটা বড় অংশ এই শহরে রিকশায় চেপে দোকান-বাজারে যেত। সে সব এখন কথার কথা—ইতিহাস। আজকের রিকশা চালকের চোখের সামনে ঝুলছে নিরাপত্তাহীনতার খাঁড়া। তার কাছে সবচেয়ে বড় কথা হল, আর ক'দিন সে রিকশা টানতে পারবে। এই শহরও শেষ পর্যন্ত মুখ ঘুরিয়ে নেবে নাতো?

দেখা যাক। ❖

ছবি: লেখক

আরব্য রজনী
চিত্রনাট্য: শিবপ্রসাদ সাহু
অঙ্কন: সুদীপ্ত কোলে ও সুমন সরকার
শাহজাদা চোখ কচলে উঠে বসল।
আমার শহর বাগদাদ চলো। আমাদের জন্য জাহাজ অপেক্ষা করছে।
বেশ, তবে তাই চলো।
তবে তার আগে মূল্যবান ধনরত্ন যতটা পারা যায় সঙ্গে নিতে হবে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো বড় পোটলা ভর্তি হিরে জহরত নিয়ে আমরা রওনা হলাম। পড়ে রইল পাষাণপুরী।
জাহাজের কাছে আসতেই সবাই উৎকণ্ঠায়।
কাল ফিরলে না কেন জুবেদা?
আর সঙ্গে এ কে?

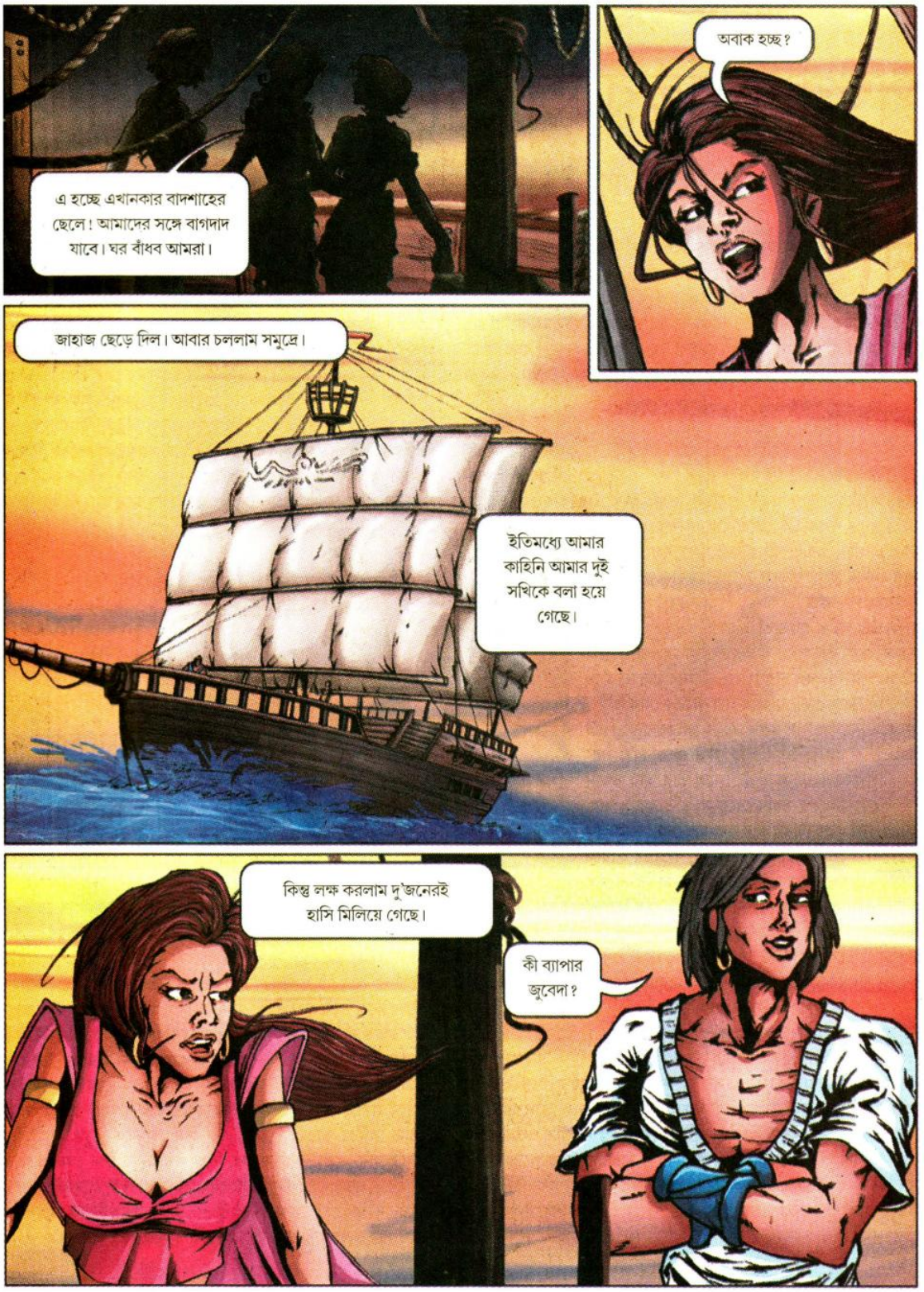
এ হচ্ছে এখানকার বাদশাহের ছেলে! আমাদের সঙ্গে বাগদাদ যাবে। ঘর বাঁধব আমরা।
অবাক হচ্ছ?
জাহাজ ছেড়ে দিল। আবার চললাম সমুদ্রে।
ইতিমধ্যে আমার কাহিনি আমার দুই সখিকে বলা হয়ে গেছে।
কিন্তু লক্ষ করলাম দু'জনেরই হাসি মিলিয়ে গেছে।
কী ব্যাপার জুবেদা?

পঞ্চাশ বছর আগের মাস্টারমশাইরা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

স্যা'র আশুতোষের জন্মের সার্ধশতবর্ষে খবরের কাগজে বাংলার বাঘের সগুম্ফ বিরাট ছবি এবং সেই সঙ্গে সেনেট হল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তার আশুতোষ বিল্ডিং, তার বিশাল বিশাল গোল থাম, তিন-মানুষ উঁচু লম্বা কাঠের দরজা-সংলগ্ন বারান্দা, নীচে ট্রাম-বাসের রাস্তা, ওপারে গোলদীঘি, আশুতোষের দেড়শো বছরে আমার পঞ্চাশ বছর আগের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের স্মৃতি মনে পড়ে গেল। সেটা ১৯৬২-৬৪ সাল। সেই সময়েই দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখতে শুরু করেছি। তার একটিতে আমার মাস্টারমশাই প্রতি সপ্তাহে লিখছেন সুনন্দর জার্নাল। সে কী তীব্র আকর্ষণ চণ্ডীর কার্টুন সম্বলিত সেই ফিচারের! পত্রিকা খুলেই লোকে ওই পাতাটি প্রথম পড়ত। যিনি কোনও পত্রিকায় গল্প লিখছেন, কোথাও ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছেন, কোথাও সপ্তাহে সপ্তাহে ফিচার লিখছেন, তিনিই আশুতোষ বিল্ডিংয়ের দশ নম্বর রুমে, মন্ত্রমুগ্ধ শ'দেড়েক ছেলে-মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে অনর্গল একটির পর একটি কবিতা মুখস্থ বলতে বলতে পঞ্চাশ মিনিট ধরে পড়িয়ে যাচ্ছেন যতীন সেনগুপ্তের কবিতাসমগ্র। কী স্মৃতি, কী ব্যাখ্যা, কী তাঁর উপস্থাপন, ক্লাসের সঙ্গে কী তাঁর গভীর একাত্মতা। পড়াতে পড়াতে ছোট্ট ছোট্ট হাসির মধ্যে কী তাঁর সরল অন্তরঙ্গতা, আবার পর-মুহূর্তেই ভাবতন্ময়তায় তিনি কত দূরের! ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিজেকে এমন উৎসর্গ করে পড়াতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

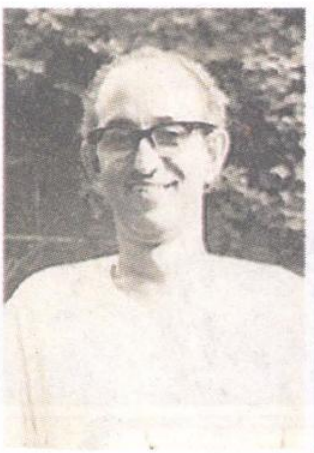

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখন 'লেকচারার'—এই পদটাই উঠে গেছে। এখন আর কেউ লেকচারার নয়। একজন শিক্ষককে 'লেকচারার' বললে তাঁর আর সম্মান থাকে নাকি? সময়ের সরণি বেয়ে সংস্কৃতি বদলে যায়, ভাষার পরিবর্তন হয়। এখন আর দাদা-দাদু নেই, সবাই কাকু বা আংকল, পিওন হয়েছে পোস্টম্যান, কন্ডাক্টর হয়েছে কালেকটর, ড্রাইভার এখন পাইলট। আগেকার দিনের সেই 'লেকচারার' শব্দটিতে অধ্যাপকের মান-মর্যাদা বুঝি আর থাকছে না। 'লেকচারার', 'রিডার' এসব আবার কী? এখন কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে সবাই প্রফেসার। কেউ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার, কেউ অ্যাসোসিয়েট, কেউ শুধু প্রফেসার। আমরা যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা সবাই ছিলেন লেকচারার। এঁদের প্রফেসার গাঙ্গুলি, প্রফেসার ব্যানার্জি বলা যেত না। বস্তুতপক্ষে আমরা যাঁদের কাছে পড়তাম তাঁদের কে লেকচারার, কে রিডার, কে প্রফেসার—এসব আমাদের কোনও ভাবনার বিষয়ই ছিল না। তাই আজ ভাবি অনেক অনেক 'প্রফেসার' পদাধিকারীর চেয়ে লেকচারার নারায়ণবাবু, লেকচারার অসিতবাবু আমাদের কাছে অনেক আদরের শিক্ষক ছিলেন। আদর্শ মাস্টারমশাই ছিলেন। শশীভূষণ দাশগুপ্ত বিভাগীয় প্রধান ছিলেন, হেডের আলাদা ঘরে বসতেন; কিন্তু শশীবাবু ও নারায়ণবাবুতে পদের কোনও প্রভেদ ছিল—এ সংবাদ সেদিন আমাদের অজানা ছিল। আমি যখন এম এ পাশ করে বিশ্বভারতীতে লেকচারার হয়ে ঢুকলাম, আমার প্রিয় মাস্টারমশাই অসিতবাবু সেদিন আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। পোস্টকার্ডের মতো একটি কার্ডে নিজে নাম ঠিকানা ছাপা—Dr. Asit K. Banerjee./Lecturer, Deptt. of Bengali/ Calcutta University। আর প্রাপকের ঠিকানায় স্যার আমার নামের নীচে লিখেছেন, Lecturer, Visva-Bharati। সেই দিনই প্রথম জানলাম আমার আদর্শ শিক্ষাগুরুর কর্মস্থলের ডেজিগনেশন। তিনি লেকচারার। আমিও লেকচারার আর তিনিও লেকচারার! আমার মাথা সেদিন মাটিতে মিশে গিয়েছিল। ছিঃ! কিন্তু সেই দিনের সেই প্রাপ্ত চিঠি আমাকে এই শিক্ষাটি দিয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পদ' তোমার প্রকৃত যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। আজকে যে সদ্য এম এ পাশ কলেজে ঢুকছে, সেই হয়ে যাচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার। অথচ নারায়ণবাবুদের মতো মাস্টারমশাইরা কোনও দিনই 'প্রফেসার' পদের ধারে কাছেও আসতে পারলেন না। অথচ পঞ্চাশ বছর আগের সেই মাস্টারমশায়দের দিকে তাকালে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। কী ব্যাপক পড়াশোনা, কী গভীর পাণ্ডিত্য; তারই মধ্যে কেউ আবার কবি, কেউ গল্পকার, কেউ ঔপন্যাসিক। আমরা কবি হরপ্রসাদ মিত্র, সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে পেয়েছিলাম। 'দ্বিজেন্দ্রলাল :কবি ও নাট্যকার' বইয়ের লেখক রথীন্দ্রনাথ রায় ছিলেন আমাদের আর এক অধ্যাপক। সাহিত্যটাকে পয়েন্টে পয়েন্টে ভাগ করে কেটে কেটে অঙ্কের মতো পড়াতেন। ওঁর পড়ানো মন দিয়ে শুনলে পরীক্ষার জন্য আর অতিরিক্ত পড়তে হত না। আমি একটু-আধটু লেখালেখি করছি বলে বয়সে যাঁরা কিছু তরুণ তাঁরা আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। আমরা যখন ছাত্র তখনই অধ্যাপক রথীন রায়ের বিবাহ হয়। ওঁর স্ত্রীর নাম ভারতী। আমি তো স্যারের ছাত্র কাম বন্ধু। আমাকে হাসতে হাসতে বললেন—কলকাতায় 'রবীন্দ্র-ভারতী' আছে তো, এখন থেকে আমি হলাম 'রথীন্দ্র-ভারতী'। আর এক দিন আমাকে হঠাৎ আড়ালে ডেকে বলেছিলেন—প্রেম করছিস কর, কিন্তু পড়াশুনায় যেন কোনও ক্ষতি না হয়। রথীনবাবু, নারায়ণবাবু এঁরা অকালেই মারা যান। কেউ 'প্রফেসার' পদে পৌঁছোতে পারেননি। তবু সেই লেকচারাররা ছিলেন অবিস্মরণীয় শিক্ষক। এইসব শিক্ষকদের কাছে পাঠ নেবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়নি, তাঁদের বড়ই দুর্ভাগ্য। ❖

নারায়ণবাবুদের (গঙ্গোপাধ্যায়) মতো মাস্টারমশাইরা কোনও দিনই 'প্রফেসার' পদের ধারে কাছেও আসতে পারলেন না। অথচ পঞ্চাশ বছর আগের সেই মাস্টারমশায়দের দিকে তাকালে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। কী ব্যাপক পড়াশোনা, কী গভীর পাণ্ডিত্য; তারই মধ্যে কেউ আবার কবি, কেউ গল্পকার, কেউ ঔপন্যাসিক।

Lose Control in Mandarmoni!

Facilities in the Resort
- 24-hour Room Service
- Multi-cuisine Restaurant
- Conference Room
- Swimming Pool
- Banquet Hall

Rides in the Amusement Park
- Cable Car
- Toy Train
- Caterpillar
- Wave Pool
- Waterfall
- Water Slides
- Musical Fountain

Water Sports
- Boating
- Jet Skiing
- Parasailing
- Banana Boat
- Bumping Boat

Extravagant thrills make it a happening retreat.

The ambience of Mauritius or Bahama is right here in West Bengal. And the pioneer being Rose Valley Resort, Mandarmoni, its Water Sports extravaganza is all set to rock you with a pulsating spirit. Come to this all-complete recreational arena, where you've ample scopes for leisure, luxury, amusement and adventure. Just tighten up to lose control over your emotions and get carried away with thriving moments.

Rose Valley
Hotels & Resorts

www.rosevalleyresorts.com
For booking, contact: 98316 99888 / 90070 22890 / 91633 99988

megaminds.in

RAJA
Biscuits

মুচমুচে মাখন!

রাজা মাখন বাইট বিস্কুট।
কামড় দিলেই উথ্‌লে পড়ে মাখন।
অথচ মুচমুচে। খেলেই বুঝবেন।

RAJA UDYOG PVT. LTD. AN ISO 9001 : 2008 CERTIFIED COMPANY